সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারতবিচিত্রা

অক্টোবর ২০২৩

তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী

মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ৮ অক্টোবর ২০২৩-এ বিহার রাজ্য সরকারের একটি প্রতিনিধিদল কর্তৃক আয়োজিত একটি ইনভেস্টরস্ মিট্-এ বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে ব্যবসার জন্য বিহারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করা হয়। এই সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম।

মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলকের সঙ্গে ঢাকায় ৪ অক্টোবর ২০২৩-এ বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'সাইবার মৈত্রী ২০২৩'-এর সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করেন। সাইবার-মৈত্রী হলো ভারত ও বাংলাদেশের সেক্টর বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও প্রফেশনালগণের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম ও ইন্টারফেস যার লক্ষ্য সাইবার নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা।

কুমিল্লা সফরকালে মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩ অক্টোবর ২০২৩-এ ময়নামতির কমনওয়েলথ ওয়্যার সিমেট্রি পরিদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহিদ সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ১০ | আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০ | অক্টোবর ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ
শতাব্দী জাহিদ

গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
ত্রিপুরা

ত্রিপুরার পৌরাণিক মহারাজা ত্রিপুরের নাম অনুযায়ী ত্রিপুরা নামটির উদ্ভব। যযাতির বংশধর দ্রুহ্যের ৩৯তম উত্তরপুরুষ হলেন রাজা ত্রিপুর। অন্য এক ব্যাখ্যার সন্ধানও মেলে, ত্রিপুরা নামটির উৎস হলো হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত দশমহাবিদ্যার একতম ত্রিপুরাসুন্দরী।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদরচনা — দুর্গাপূজায় মহালয়া ও কুমারীপূজা ॥ তারাপদ আচার্য্য ০৩
বাঙালির শারদোৎসব ॥ সুদেব চক্রবর্তী ০৫

শ্রদ্ধাঞ্জলি — মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় স্বচ্ছতা এবং এর প্রাসঙ্গিকতা ॥ ড. মিল্টন বিশ্বাস ০৮

মৃত্যুশতবর্ষ — ব্যতিক্রমী এক দীপ্যমান সুকুমার রায় ॥ মোজাম্মেল হক নিয়োগী ১২

প্রবন্ধ — জীবনানন্দ ও লাবণ্য দাশ ॥ মুহম্মদ মতিউল্লাহ্ ১৫
কানুর বংশীধারী শচীন কর্তা ॥ ওয়াহিদুর রহমান শিপু ২৭

সৌহার্দ ভ্রমণ — বাংলাদেশি গণমাধ্যমের ভারত দর্শন ॥ ওবায়দুল কবির ১৯

পঙ্‌ক্তিমালা — রণজিৎ দাশ ॥ ফরিদ কবির ॥ চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ॥ মারুফ রায়হান
আমিনুর রহমান সুলতান ॥ সন্তোষ ঢালী ॥ টোকন ঠাকুর
শঙ্খশুভ্র পাত্র ॥ শেলী সেনগুপ্তা ॥ জাহানারা পারভীন
মামুন খান ॥ শিলাদিত্য হালদার ॥ বিশ্বজিৎ ॥ শতাব্দী জাহিদ
তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায় ॥ লেবিসন স্কু ॥ হাসান মুস্তাফিজ ২৪-২৬

ছোটগল্প — অচল মানুষ ॥ মঈনুল হাসান ২৯

ধারাবাহিক উপন্যাস — বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৩

সাক্ষাৎকার — বাঙালির পরিমণ্ডল বিস্তৃত হবে ॥ পবিত্র সরকার ৩৭

কেন্দ্রবিন্দু — ত্রিপুরা ॥ দেবলাল বিশ্বাস ৪১

ইতিহাস — সমাজ-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিকাশধারায় বাংলাদেশের বাগদি জাতি ॥ মিলন রায় ৪৫

শেষ পাতা — লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমিয়া সাহিত্যের প্রাণপুরুষ ॥ সৈয়দ নূরুল আলম ৪৮

সম্পাদকীয়

আষাঢ়-শ্রাবণ শেষে হাজির হয় শরৎ। আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘ, মেঘ-রোদের লুকোচুরি খেলায় প্রকৃতি হয়ে ওঠে নবদীপ্ত। নীলাভ আকাশ ছুঁয়ে ফুলের মালার মতো দল বেঁধে উড়ে যায় বাহারি পাখি। ধানের খেতে বাতাস নেচে যায়। খালবিল কিংবা নদীর ধারে ফোটে সাদা কাশফুল। ঘাসের ওপর ছড়ানো থাকে গন্ধে মাতোয়ারা শিশিরভেজা শিউলি-বকুল। তখন অপরূপ শোভায় সাজে বাংলার নিসর্গ। আমাদের পল্লিজননী মুখর হয় শারদ উৎসবে। উৎসবপ্রিয় বাঙালি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং হাসি আনন্দে মেতে ওঠে। চারদিকে আলোর রোশনাই ঝিকমিক করে। এসময়ে এ ঋতুর মুখ্য আকর্ষণ হয়ে আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে পূজার আগমনি বাঁশি।

সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ মহা আড়ম্বরে পালন করে দুর্গাপূজা। এটি মূলত ভারত উপমহাদেশে উদ্‌যাপিত প্রাচীন উৎসব। বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, বিহার, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশে এ পূজা বৃহৎ পরিসরে উদ্‌যাপিত হয়। এ পূজা বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসবও বটে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে দেবী দুর্গার আগমনের জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতীক্ষায় থাকে সারাবছর।

যদিও দুর্গাপূজার শুরু কোথায়, তা এখনো অনুদ্ঘাটিত। তবে ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও প্রমাণ রয়েছে সিন্ধু সভ্যতায় দেবীমাতা, ত্রিমস্তক দেবতা ও পশুপতি শিবের পূজা হতো। দুর্গামূর্তি বিভিন্ন আদলের হয়ে থাকে। তবে দুর্গার যে মূর্তিটি সাধারণত পূজিত হয় সেটি পরিবারসমন্বিতা। জানা যায় কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ১৬১০ সালে বাংলায় সপরিবার দুর্গাপূজার প্রচলন করেন।

দুর্গা শক্তির মূর্ত রূপ, তিনি পরম ব্রহ্ম। অন্যান্য দেব-দেবী তার বিভিন্ন রূপের প্রকাশমাত্র। দেবী দুর্গা হলো 'দুর্গতিনাশিনী' বা সকল দুঃখ-দুর্দশা হরণকারিনী। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত আছে রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা শরৎকালে দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। এ সময় দেবতারা মহাঘুমে তন্ময় থাকেন। তাই এটি তাদের পূজা করার যথাযথ সময় নয়। অকালে হয় বলে দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে অনেক পৌরাণিক গল্পকাহিনি আছে, তার মধ্যে রাজা সুরথের গল্প, মধুকৈটভের কাহিনি, মহিষাসুরবধ কাহিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে জনশ্রুত গল্পটি হলো মহিষাসুরবধকাহিনি। দেবতাগণ মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করেন এবং মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরবধের পথ খুঁজতে থাকেন। দেবতারা একত্রিত হয়ে পরমব্রহ্মের অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্মরণাপন্ন হন এবং মহিষাসুরের অসহনীয় অত্যাচারের বর্ণনা করতে থাকেন। তখন রাগে-ক্ষোভে তাদের মুখমণ্ডল বিশাল আকার ধারণ করে এবং তেজোদীপ্ত বহ্নিশিখা নির্গত হয়ে একটি আলোকপুঞ্জে পরিণত হয়। ঐ আলোকপুঞ্জ থেকে আবির্ভূত হন ত্রিনয়না দশহস্তধারী এক দেবী মূর্তি। এই দেবীই হলেন দশভুজা মাদুর্গা। তারপর একে একে দেবতারা দেবীকে দিব্যঅস্ত্রে সজ্জিত করল। আদ্যাশক্তি মহামায়া অসুরকুলকে নাশ করে স্বর্গ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভক্তকুলের কাছে পূজিত হলেন।

দেবী দুর্গা ত্রিনয়নধারী তাই তাঁকে 'ত্রৈম্বক্যে' বলা হয়। তাঁর বাম চোখ হলো বাসনা, ডান চোখ কর্ম ও কেন্দ্রীয় চোখ হলো জ্ঞানের প্রতীক। দুর্গার দশহাতে যে দশটি অস্ত্র রয়েছে, সেই অস্ত্রসমূহও বিভিন্ন প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করে। শঙ্খ ওঙ্কার ধ্বনির অর্থবহতার প্রতীক, তির-ধনুক দেবীর শক্তিমত্তার প্রতীক, মায়ের হস্তে ধৃত বজ্রাগ্নি হলো ভক্তের সঙ্কল্পের দার্ঢ্য।

দুর্গার হাতের পদ্ম–পদ্ম যেমন কাদামাটির ভেতর হতে অনাবিল সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি দেবীর উপাসকরাও যেন লোভ-লালসার জাগতিক মোহের ভেতর হতে আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে তার চিহ্ন। দেবীর সুদর্শন চক্র শুভর লালন ও অশুভ বিনাশের প্রকাশ বহন করে। দুর্গার হাতের তলোয়ার জ্ঞানের ইঙ্গিত, ত্রিশুল হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকাশ। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ-শোক, জ্বরা, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই হলেন জগজ্জননী দুর্গা। সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও এই দুর্গতিনাসিনীর প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান।

প্রতিবারের মতো নিয়মিত বিভাগসমূহ থাকছে।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা। কল্যাণ হোক।

প্রচ্ছদরচনা

দুর্গাপূজায় মহালয়া ও কুমারীপূজা

তারাপদ আচার্য্য

মহালয়া তিথিকে বলা হয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিপর্ব। যেকোনো শুভ কাজের আগে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করতে হয় তেমন মাতৃ আরাধনার আগে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তিলজল নিবেদন করতে হয়। এর মূলে রয়েছে বিশ্বাস–কেউ মারা গেলেও তাঁর আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মার বিনাশ বা ক্ষয় নেই। পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য মহালয়ার তর্পণ-শ্রাদ্ধ। তর্পণ-শ্রাদ্ধ শেষ করেই দেবীপক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মহালয়া হলো পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবীপক্ষের শুরুর সন্ধিক্ষণ। বলা যায় মহালয়া দেবীপক্ষের শুরু

'মহালয়া' কথাটি এসেছে মহালয় থেকে। মহালয়ের অর্থ পরমাত্মা। বৃহৎ আলয়। সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়। ব্যাকরণগত দিক–মহান আলয় যাহাতে তাহা–বহুব্রীহি সমাস। মহালয় + আপ–স্ত্রীলিঙ্গে মহালয়া। অন্যদিকে–মহালয়া যেহেতু একটি তিথি–এই তিথি শব্দটি সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ বলেই বিশেষণ হিসেবে শব্দটি হয়েছে মহালয়া।

মহালয়া হলো শারদীয়া দুর্গা পূজার পূর্ব অমাবস্যা–অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। (অমাবস্যা–অমা + বস + য, অধিকরণ বা + আপস্ত্রীং। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। এই তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদিত হয় এবং সূর্যের সঙ্গে সমসূত্রভাবে অবস্থিতি করে–সারা রাত অন্ধকার থাকে। ইংরেজিতে বলে 'Day of the new moon.'

স্কন্দ পুরাণে মহালয়া শব্দটি পাওয়া যায়। মাহেশ্বর খণ্ডে সমুদ্র মন্থনের কাহিনি রয়েছে। সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে অমৃত কুম্ভ উঠেছিল। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃত নিয়ে বিবাদ হয়। বিবাদস্থলে দেবতাদের আহ্বানে দেবী মোহিনীর ছদ্মবেশে স্বয়ং বিষ্ণু অবতীর্ণ হন। ছলাকলা করে অমৃত পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দেবতারা অমৃত পান করে হয়েছিলেন অমর। অমৃত না পেয়ে অসুররা হয়েছিলেন মরণশীল।

দেবী মোহিনী হলেন দেবতাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ মহৎ আলয়। দেবী মোহিনীকে দেবতারা মহালয়া তিথিতে আরাধনা করেছিলেন। সেই থেকে দেবী মোহিনী মহালয়া নামে স্বীকৃতি পান।

১৪,৪৪০ (২০২৩ সালের হিসাবে) বছর আগে ১৬ ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিতে এক মহা-লয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়েছিল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে (Swelling of water in the Sea–এর ছোট্ট সংস্করণ সুনামি Tsunami–High sea-wave.) সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগ জলের তলায় চলে যায়। পামির মালভূমিসহ কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চল ডুবতে বাকি ছিল। সে সময়কার হিসেবে কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলেন ওই জলোচ্ছ্বাসে। বহু জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। পার্বত্য এলাকায় যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা জল সরে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। হাজার হাজার বছর পরে হলেও আর্যরা আমাদের ভারতবর্ষে আসেন। তখন ভারতবর্ষে অনার্যরাও ছিলেন। আর্য ঋষিগণ বৈদিক যুগে হাজার হাজার বছর আগের ওই ১৬ ভাদ্রের অমাবস্যায় সংঘটিত মহাপ্রলয়ে মৃতদের উপলক্ষ

করে মঘা নক্ষত্রে বিষুব মিলনকালীন সূর্যকে 'পিতৃগণ' নামে স্তব করেছিলেন। ভাদ্র মাসের অমাবস্যার ১৪ দিন পূর্ব থেকে নানান অর্ঘ্য দিয়ে সূর্যের উপাসনা চালু করেছিলেন। 'পিতৃগণ' নামধারী সূর্যই হলেন পূর্বপুরুষ।

শ্রীতপন আচার্য তাঁর 'মহালয়া' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় 'পিতৃগণ' নামধারী সূর্যার্ঘ্য দান রূপান্তরিত পিতৃপুরুষের অর্পণে। দেখা যাচ্ছে, ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিটি যে মহালয়া নামে চিহ্নিত হয়েছে এর উৎস বোধ হয় ওই মহা-লয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় থেকে। (মহালয় স্ত্রীলিঙ্গে মহালয়া)। আবার তর্পণ-শ্রাদ্ধে দেখা যায়, তর্পণকারী জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিক তাকিয়ে তিলজল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য নিবেদন করছেন। আর্য-ঋষি-নির্দিষ্ট সূর্যই পিতৃগণ তথা পিতৃপুরুষ তথা পূর্বপুরুষ।'

শাস্ত্র অন্য কথাও বলে, মহালয়া তিথিতে হিন্দু ধর্মালম্বীরা তাদের পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। যারা পিতৃ-মাতৃহীন তারা তাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেন, তাদের প্রতি তর্পণ অর্পণ করেন এবং তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে অঞ্জলি প্রদান করেন। সনাতন ধর্মানুসারে, এই দিনে মূলত প্রয়াত আত্মাদের মর্ত্যে পাঠানো হয়। প্রয়াত আত্মার এরূপ সমাবেশকে মহালয় বলা হয়। আর এই মহালয় থেকেই মহালয়ার উদ্ভব।

পুরাণ-কাহিনির আলোকে বলা যায়–সূর্যই আমাদের মহা-আলয়–সমগ্র জীবজগৎ তার মহৎ আলয়ে প্রতিপালিত। 'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য দেবো ভব'–এই আপ্তবাক্যটিকে মূলধন করে দেবতার জ্ঞানে জন্মদাতা পিতা-মাতা, শিক্ষাদাতা শিক্ষককে আশ্রয় করে আমাদের চলমান জীবনচর্যা। আবার দেশবরেণ্য এবং বিশ্ববরেণ্য মনীষীরাও একেকজন মহৎ আলয় বা মহালয়। কাজেই মহালয় কথাটি বা শব্দটি এখানে বহুমাত্রিক হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দুর্গোৎসবে কুমারীপূজা

শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'দিব্যচক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারীপূজা। শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীকে ভগবতীর অংশ বলেছেন। শুধু কুমারী নয়, তার শুদ্ধ দৃষ্টিতে সব রমণীই সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলতেন, "মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব।" কুমারীর মধ্যে দৈবী ভাবের প্রকাশ দেখা বা তাকে জননী রূপে পূজা করা সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালেও পারবে না।'

মনু বলেছেন,

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তএ দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যতে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।'

অর্থাৎ, যেখানে নারীগণ পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। যেখানে নারীগণ সম্মানিতা হন না, সেখানে সকল কাজই নিষ্ফল। (মনুসংহিতা, ৩.৫৬)।

কুমারীপূজার মাহাত্ম্য যোগিনীতন্ত্রে পাওয়া যায়–

'পূজিতৈকা কুমারী চেদদ্বিতীয়ং পূজনং ভবেৎ।
কুমারী পূজনফলং ময়া বক্তুংন শক্যতে ...॥'

কুমারীপূজা হলো তন্ত্রশাস্ত্রমতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়েকে পূজা করা। বিশেষত দুর্গাপূজার অঙ্গরূপে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর দুর্গাপূজার মহাষ্টমী পূজার শেষে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয় তবে মতান্তরে নবমী পূজার দিনও এ পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সুদূর অতীত থেকেই কুমারীপূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কুমারীপূজা প্রয়োগ' গ্রন্থের পুথি থেকে।

যোগিনীতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, দেবীপুরাণ, স্তোত্র, কবচ, সহ স্রনাম, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, পুরোহিতদর্পণ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থে কুমারীপূজার পদ্ধতি এবং মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনানুসারে কুমারীপূজায় কোনো জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ নেই। দেবীজ্ঞানে যেকোনো কুমারীই পূজনীয়। তবে সাধারণত ব্রাহ্মণ কুমারী কন্যার পূজাই সব জায়গায় প্রচলিত। এক্ষেত্রে এক থেকে ষোলো বছর বয়সী যেকোনো কুমারী মেয়েকে পূজা করা যায়। তন্ত্রসারে বয়সের ক্রমানুসারে পূজাকালে এই কুমারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, এক বছরের কন্যার নাম সন্ধ্যা, দুই বছরের কন্যার নাম সরস্বতী, তিন বছরের কন্যার নাম ত্রিধামূর্তি, চার বছরের কন্যার নাম কালিকা, পাঁচ বছরের কন্যার নাম সুভাগা, ছয় বছরের কন্যার নাম উমা, সাত বছরের কন্যার নাম মালিনী, আট বছরের কন্যার নাম কুষ্ঠিকা, নয় বছরের কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশ বছরের কন্যার নাম অপরাজিতা, এগারো বছরের কন্যার নাম রুদ্রাণী, বারো বছরের কন্যার নাম ভৈরবী, তেরো বছরের কন্যার নাম মহালক্ষ্মী, চৌদ্দ বছরের কন্যার নাম পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোলো বছরের কন্যার নাম অন্নদা বা অম্বিকা।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের ঋষি অম্ভৃণ-কন্যা বাক ছিলেন কুমারী। তিনি আদ্যাশক্তির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী এবং সমগ্র জগতের পিতার প্রসবিতা। কুমারীকন্যা বাকের এই অসাধারণ উক্তি শক্তিসাধনার ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। এই ধারারই আরেকটি অসাধারণ তাৎপর্যবাহী মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (১০।২) দুর্গা-গায়ত্রী, যেখানে দুর্গাকে কন্যাকুমারী-রূপে স্তুতি করা হয়েছে। তারপর চণ্ডীতে (২য় অধ্যায়) পেলাম মহিষাসুরমর্দিনীকে। মহিষাসুরমর্দিনী সমস্ত দেবতার তেজোসম্ভূতা। কাত্যায়নী দেবীও কুমারী। এই কন্যাকুমারী দুর্গাই প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বধ করেন। চণ্ডীতেই আবার দেবী কৌশিকীর কথা পাই (৫ম অধ্যায়), যিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন। দেবী কৌশিকীও ছিলেন কুমারী। তাঁর সম্পর্কে শিবপুরাণসংহিতায় বলা হয়েছে যে, তিনি অযোনিজা এবং পুংস্পর্শ-রহিত কুমারীকন্যা। মহাভারতে (বিরাট পর্ব, ৬) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তোত্রে বলা হয়েছে, তিনি কুমারী, কৌমার্যব্রতধারিণী এবং ব্রহ্মচারিণী। আদ্যাশক্তির এই কুমারী রূপে পাঁচ বিখ্যাত প্রকাশই হিন্দু উপাসনার তন্ত্র এবং পুরাণে কুমারীপূজার উৎস।

দুর্গার আরেক নাম কুমারী। শাস্ত্রমতে, কুমারীপূজায় সাধকের সর্বাভীষ্ট লাভ হয়। কুমারীপূজা ছাড়া হোমাদি সকল পূজা পরিপূর্ণ ফলদায়ী হয় না। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শক্তিপীঠে কুমারীপূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই কামাক্ষ্যা মন্দিরে কুমারীপূজা একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পেছনে বৈদিক ধর্মোপাসনার যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি রয়েছে শক্তিকেন্দ্রিক তান্ত্রিক সাধনারও প্রভাব। তন্ত্রমতে কুমারীকন্যাকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে পূজা করা হয়।

বেলুড় মঠের ১৯০১ সালে প্রথম দুর্গা পূজা আরম্ভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাসটি ছিল ইংরেজি অক্টোবর বাংলা আশ্বিন-কার্তিক এবং স্বামী বিবেকানন্দ কুমারীপূজার আয়োজন করেছিলেন।

'স্বামীজীর অনুরোধে গৌরীমা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা) কুমারীপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খবলয়-বস্ত্রাদি সহযোগে স্বামীজি স্বয়ং নয়জন অল্পবয়স্কা কুমারীকে পূজা করেন। এই সকল জীবন্ত প্রতিমার চরণে অঞ্জলি এবং তাঁহাদের হাতে মিষ্টান্ন, দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া স্বামীজি তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। একজন কুমারী এতই অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং পূজাকালে এমনই ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কপালে রক্তচন্দন পরাইবার সময় স্বামীজি শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন–'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো'।'

কুমারীপূজা ভারতের ওড়িষ্যা ও বিহারসহ বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নেপালে দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেদিন সরকারিভাবে ছুটি পালন করা হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে কুমারীপূজা হয়ে আসছে, এছাড়াও বিভিন্ন পূজামণ্ডবে কুমারীপূজা হয়ে থাকে।

কুমারী দেবী ভগবতীর অতি সাত্ত্বিক রূপ। জগন্মাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েও চিরকুমারী। কুমারী আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতীক। দুর্গার আরেক নাম কুমারী। মহাভারত থেকে জানা যায় অর্জুন কুমারীপূজা করতেন। মূলত নারীর যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতেই কুমারীপূজার আয়োজন করা হয়। মাটির প্রতিমায় যে দেবীর পূজা করা হয়, তারই বাস্তবরূপ কুমারীপূজা। কুমারীতে সমগ্র মাতৃজাতির শ্রেষ্ঠ, শক্তি, পবিত্রতা, সৃজনী ও পালনী শক্তি, সকল কল্যাণী শক্তি সূক্ষ্মরূপে বিরাজিতা। •

তারাপদ আচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক, সাধু নাগ মহাশয় আশ্রম
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদরচনা

বাঙালির শারদোৎসব

সুদেব চক্রবর্তী

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব, কিন্তু এর মধ্যে শেষ পাঁচ দিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাঙালি এই পাঁচ দিনেই পূজা ও নানা আয়োজনে ভরিয়ে তোলে। দুর্গার নাম প্রথম পাওয়া যায় বৌধায়ন ও সাংখ্যায়নের সূত্রে। দুর্গা অর্থ হলো যিনি দুর্গতি নাশ করেন। স্কন্দপুরাণ অনুসারে জানা যায়, দুর্গাসুরকে বধ করার কারণে দেবী মহামায়ার নাম দুর্গা বলে পরিচিতি পায়। স্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবী বলছেন–'অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যাতি।' আবার অনেক পণ্ডিতের মতে, দেবী দুর্গা প্রথমদিকে দুর্গের রক্ষিণী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে তার নাম হয় দুর্গা। অবশ্য কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে দুর্গের রক্ষিণী হিসেবে দুর্গা নয়, দেবীর নাম অপরাজিতা উল্লেখ করেছেন

এই দুর্গা হলো আদ্যাশক্তি মহামায়া যিনি গৌরবর্ণা বলে তার নাম গৌরী, পর্বতের কন্যা বলে তিনি পার্বতী, দুর্গতিনাশিনী বলে তিনি দুর্গা, আবার বিজয়ে সহায় হন বলে তিনি অপরাজিতা।

ভারতবর্ষে মূলত বহু প্রাচীন কাল থেকেই শক্তিপূজা হয়ে আসছে। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। শক্তিপূজা মানে নারীশক্তির বন্দনা। ভারতীয় পুরাণ অনুসারে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, কিন্তু ইন্দ্রের বৃষ্টি ধারণ করার শক্তিকে ইন্দ্রানী নামে পূজা করা হয়েছে। একইভাবে বায়ু বহন করার শক্তি পবনানী কিংবা রুদ্রের সংহার শক্তি রুদ্রানী পূজিত হন। আর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়–সবকিছুর সম্মিলিত রূপ হলো মহামায়া, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। দুর্গা হচ্ছেন সেই মহামায়ার একটি রূপ। পৌরাণিক কাহিনিতে আমরা সেটাই দেখি–ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্টি হলো দেবী দুর্গার। প্রাচীন ভারতে বা বৈদিক যুগেও আমরা শক্তিপূজার বিবরণ পাই। আর বাংলার বৈশিষ্ট্যই হলো মাতৃশক্তির বন্দনা। এখনও এর নিদর্শন রয়েছে। যেমন–বাংলার সর্বত্র কালী মন্দির, কালী বাড়ি দেখা যায়। কেননা, ব্রহ্মযামলতন্ত্রে বলা হয়েছে–কালী হলেন বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কালী দুর্গা তথা মহামায়ারই আরেকটি রূপ। আর বাংলা হলো শাক্ত সাধনার প্রধান লীলাভূমি। শাক্ত দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে এবং তন্ত্রমত বাংলায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। শুধু তাই নয়, প্রধান প্রধান তন্ত্রগুলো বাংলাতেই উৎপন্ন। এর একটা কারণ হতে পারে তৎকালীন বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। গবেষক অতুল সুরের মতে, তন্ত্রধর্মের উদ্ভব হয়েছিল নবোপলীয় যুগে ভূমিকর্ষণের ব্যাপার নিয়ে। আমরা জানি প্রত্নোপলীয় যুগে মানুষ যাযাবর জীবনযাপন করত এবং শিকারের মাধ্যমে পশুমাংস খেয়ে জীবনধারণ করত। পুরুষেরা যখন শিকারে যেত এবং ফিরতে দেরি হতো, তখন নারীরা গাছের ফল খাওয়া শুরু করল। যেহেতু নারীরা সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া জানত, তাই তাদের ভাবনায় পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের বিষয় চলে আসে। তারা তখন পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করল। এই লিঙ্গ শব্দটি পরবর্তীতে লাঙ্গুল, এবং বর্তমানে লাঙল শব্দে রূপ নিয়েছে। তারপর প্রথম ফসল ঘরে তোলার যে উৎসব হলো, যেটি নবান্ন উৎসব নামে পরিচিত, সেই উৎসবে জন্ম নিলো লিঙ্গ পূজা এবং ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। গবেষক অতুল সুরের মতে, এই আদিম উৎসব থেকেই উদ্ভব হয়েছিল শিব ও শক্তির পূজা। এ থেকেই প্রমাণিত শিব মূলত অনার্য দেবতা, পরে তার আর্যীকরণ করা হয়েছে। পুরাণের কাহিনি দক্ষযজ্ঞে আমরা দেখি আর্যকন্যা পার্বতী শিবকে পতিরূপে গ্রহণ করায় আর্যরা তা মেনে নিতে পারেনি। কারণ শিব অনার্য। তাকে শ্মশানচারী, অসভ্য, নেশাখোর, ভূত-প্রেতের সহচর বলে নানা নিন্দা করা হয়েছে। পার্বতী এসব সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করেন আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। আর এর ফলেই ঘটে যায় দক্ষযজ্ঞ। আর্যরা শিবের এই পরাক্রম দেখে তাকে কেবল দেবতা হিসেবেই মেনে নেয়নি বরং তাকে দেবাদিদেব মহাদেব নামেও অভিহিত করে। সুতরাং অনার্যপ্রধান বাংলায় শিব আর শক্তির পূজাই তো হবে। বাঙালি বিশ্বাস করে–শিব হলো শক্তি, আর শক্তি বিনা শিবও শব হয়ে যায়। ফলে দেখা যায় এই অঞ্চলে বেশিরভাগ মাতৃশক্তির সাথে শিব জড়িয়ে আছে। কেননা এই মাতৃশক্তি তথা আদ্যাশক্তিই হলো পার্বতী, কালী, চণ্ডী, দুর্গা, অপরাজিতা, মহামায়া। অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী'র মতে চণ্ডীর আবির্ভাব বাংলাতেই। এজন্যই দুর্গা পূজায় নবপত্রিকা পূজা হয়, অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে দেবীকে চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়, চণ্ডীর ঘট বসিয়ে পূজা ও চণ্ডীপাঠ করা হয়, আবার দশমীর দিনে বিসর্জনকালে অপরাজিতার পূজা করা হয়।

সুতরাং দুর্গাপূজার সাথে বাংলার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বাংলায় প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্তত এক হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। সবচেয়ে বড় কথা দুর্গাপূজার সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালি জীবনের নানা অনুষঙ্গ। বাঙালি সংস্কৃতির এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে দেবী দুর্গার সাথে। পুরাণের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুর্গা পূজা মূলত বহিরাগত আর্যদের হাতে অনার্যদের পরাজয়ের প্রতীক। কিন্তু বাংলায় দুর্গা অন্যরকম এক প্রতীক। দুর্গা কেবল মহিষমর্দিনীই নয়, বরং একজন মা যিনি সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন। বাঙালির কাছে দুর্গা তাই ঘরের মেয়ে। এই অঞ্চলের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যে মাতৃ তান্ত্রিকতা, সেই জায়গা থেকেও নারীকে আদিশক্তি হিসেবে বন্দনারও বড় প্রতীক হলো দুর্গা। আবার দুর্গাপূজা আগে হতো বসন্তকালে, কিন্তু বাংলায় দুর্গাপূজা প্রসিদ্ধ হলো শরৎকালে। কারণ বাংলার নবপত্রিকা পূজা, যেটি পরবর্তীতে দুর্গাপূজার সাথে একীভূত হয়েছে। তাছাড়া এই নবপত্রিকা পূজার সাথেই জড়িয়ে আছে কৃষিনির্ভর আদিবাংলার শিব-শক্তি পূজা। নবপত্রিকা হলো কদলী (কলা), হরিদ্রা (হলুদ), কচু, জয়ন্তী, বিল্ব (বেল), দাড়িম্ব (ডালিম), অশোক, মানকচু ও ধান–এই নয়টি উদ্ভিদ। এই নয়টি উদ্ভিদেরই একেকজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী রয়েছেন। যেমন–ব্রহ্মাণী, কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি। শারদীয় দুর্গাপূজায় এই নয় দেবী একত্রে নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা নামে পূজিত হন। আবার প্রাচীন বাংলায় একই সময়ে পর্ণশবরীর পূজা হতো। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সারা গায়ে কাদা মেখে কেবল গাছের পাতা দিয়ে যৌনাঙ্গ ঢেকে যৌনতার ভঙ্গিতে নাচ করত। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই নাচ নিষিদ্ধ করার পর দেবীর নাম বদলে রাখা হলো সর্বশবরনাম ভগবতী বা দুর্গা। পরবর্তীতে এগুলোকেই একত্রকরে করে দুর্গাপূজা শুরু হয়। এখন প্রশ্ন হলো অকালে কেন? মানে শরৎকালে কেন? এর সহজ উত্তর হলো নবপত্রিকা পূজা শরৎকালে হতো। কিন্তু অকালবোধন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে যেটি সর্বজনস্বীকৃত, সেটি হলো রামায়ণের রাম অকালে বোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন বলেই শরৎকালে দুর্গাপূজার চল শুরু হলো। কিন্তু

মূল রামায়ণ, অর্থাৎ বাল্মীকি'র রামায়ণে রাম কর্তৃক অকালবোধনের উল্লেখ নেই। এটি আছে কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণে। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস–এর রামায়ণ একটি ডিকনস্ট্রাকশন, যেখানে বাংলার জীবনধারা ও সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। যে রামায়ণটি হয়ে উঠেছে একান্তই বাংলার। অকালবোধন বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

বোধন শব্দের অর্থ হলো জাগরণ। দুর্গাবোধন মানে হলো দেবী দুর্গাকে জাগানো। দেবী দুর্গাকে জাগাতে হবে কেন? এটার যে পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সেটা হলো–আমরা ভূগোলশাস্ত্রের মাধ্যমে দুটো শব্দের সাথে পরিচিত। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। সূর্য যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে থাকে তখন উত্তরায়ণ বলা হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে থাকলে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়ণের সময়ে দেবতারা জেগে থাকেন, কিন্তু দক্ষিনায়নের সময় দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। এই সময়টা হলো শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ–এই ছয় মাস। যেহেতু এই সময়ে দেবীকে জাগিয়ে তোলা হলো তাই বলা হয় অকালবোধন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে–দক্ষিণায়নকালেও অনেক পূজা হতে দেখা যায়। সেগুলোকে 'অকালে পূজা' কেন বলা হবে না? এই সময়ে কোন কোন পূজা প্রচলিত সেগুলো দেখলেই আমরা বিষয়টা ধরতে পারব। এই সময়ে মনসা, শনি, নারীদের বিভিন্ন ব্রত, বাস্তুপূজা প্রভৃতি হয়ে থাকে। এই সমস্ত দেবদেবী কিন্তু লৌকিক দেবী। আমরা জানি বহু লৌকিক দেবতার শাস্ত্রানুমোদন ঘটেনি, আবার কারো কারো ঘটেছে। বিশেষত বাংলায়। তাছাড়া বাংলায় বহু ব্রত পালন হয়ে থাকে যেগুলো একেবারেই লৌকিক। তাই যখন সিন্ধু অঞ্চলের সকল বিশ্বাস এমনকি বাংলার বহু মতবাদের আর্যীকরণ ঘটার ফলে হিন্দু ধর্ম একটা সমন্বিত রূপ লাভ করেছে, সেই সময়ে দক্ষিণায়ণকালে দুর্গাপূজা অকালবোধনই বটে। এবার আসা যাক রামের প্রসঙ্গে। আমরা জানি যে আর্যরা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। নর্ডিক এবং আলপীয়। আলপীয়রা কৃষিজীবী ছিল। এরা ফলন বাড়াতে যাদের উপাসনা করত তাদের বলত অসুর। এই অসুর আর স্থানীয় অনার্য যাদেরকে অসুর বলা হতো তার ভেতর প্রভেদ আছে। এই যে নর্ডিকরা তারা যাদের উপাসনা করত তাদেরকে বলত দেব। এদের হাত ধরেই বেদ আসে, যখন এদের একটি অংশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় আস্তানা বানায়। এদের দেবতা ছিল ইন্দ্র। রাম ছিলেন নর্ডিক গোষ্ঠীর। সেই রাম একজন দেবীর পূজা করবেন এটা কীভাবে সম্ভব! সেটাও আবার প্রাগার্যদের দেবী! কারণ বৈদিক বা আর্যদের কোনো নারী দেবতা ছিল না। তাহলে কৃত্তিবাস তার রামায়ণে রাম কর্তৃক অকালবোধনের বিষয়টা কেন আনলেন? বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় ঋষি অগস্ত্য রামকে রাবণ বধের জন্য সূর্য উপাসনার কথা বলছেন যা 'আদিত্য হৃদয়ম' স্তোত্র নামে পরিচিত। সূর্য বৈদিক দেবতা, তাই এটা স্পষ্ট যে কৃত্তিবাস তার রামায়ণে বাংলার সংস্কৃতির সাথে বিষয়টা সমন্বয় করতে অগস্ত্যের বদলে নারদ এবং সূর্যের বদলে দুর্গাপূজার কথা অবতারণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের কম্বন রামায়ণেও আমরা এরকম ডিকনস্ট্রাকশন দেখি। সেখানে রাম পূজা করছেন শিবের। কেননা, শিব দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় দেবতা। অর্থাৎ, বাংলা যেহেতু মাতৃশক্তি বন্দনার লীলাভূমি, তাই রামায়ণের রামকে বাংলা রামায়ণে শত্রু বধের জন্য মাতৃশক্তির আরাধনাকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অকালবোধনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কৃত্তিবাস সম্ভবত এক্ষেত্রে কালিকাপুরাণ থেকে কিছু বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। যেমন–বৈদিক যজ্ঞ হতো সকালে। কিন্তু দুর্গার বোধন হয় সন্ধ্যায়। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দনের স্মৃতিতে আমরা দুর্গাপূজার ছয়টি কল্প পাই। কিন্তু বাংলায় কেবল ষষ্ঠ্যাদিকল্প প্রচলিত অর্থাৎ ষষ্ঠির দিনে সন্ধ্যায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। রাম কর্তৃক দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে দেখা যায় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ বোধনস্তব করে বলছেন–'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।' দেবী তখন চণ্ডীকারূপে প্রকাশিত হয়ে বললেন–আমি শারদীয়া শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করব। অষ্টমীতে রাম ও রাবণের ভয়ংকর যুদ্ধ হবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণ নিহত হবে। ওই সন্ধিক্ষণেই সন্ধিপূজা হয়ে থাকে। আর দশমীতে রাম বিজয়োৎসব করেন। এ কারণেই দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। বাঙালির কাছে এটা হলো শুভ শক্তি কর্তৃক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়।

বাংলায় যে দুর্গাপূজা সেটি আসলে মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে অসুররা স্বর্গরাজ্য দখল করে দেবতাদেরকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্বর্গরাজ্য ফিরে পেতে তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের নিকট যান। কিন্তু মহিষাসুর শিবভক্ত এবং শিবের বরে বলীয়ান হয়েই দেবতাদেরকে পরাজিত করেছে। তাই শিবও অপারগ মহিষাসুরের মৃত্যুবিধান দিতে। তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের ক্রোধ থেকে যে জ্যোতি বের হলো, সেই জ্যোতি থেকেই সৃষ্টি হলো দেবী দুর্গার। এই দুর্গাই যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করলেন। আগেই বলেছি শিব অনার্য দেবতা ছিলেন, যাকে পরবর্তীতে আর্যীকরণ করা হয় এবং অসুর বলা হতো এই অনার্যদেরকেই। মহিষাসুরকে আমরা ধরে নিতে পারি মহিষ টোটেমধারী অসুরদের নেতা। তাহলে কি দুর্গাপূজা সেই বহিরাগত আর্যদের বিজয় গৌরবের সাথে সংহতি প্রকাশ? এসব নিয়ে ঢের বাহাস চলে। কিন্তু মিথোলজি আর ইতিহাস এক বিষয় নয়। বরং মিথোলজি অঞ্চলভেদে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার সংস্কৃতিতে সুর-অসুর হলো শুভ-অশুভ শক্তির প্রতীক। বৈদিক, পৌরাণিক সকল বিষয়ের সাথে বাংলার লৌকিক বিষয়গুলোর একটা সমন্বয় হলো দুর্গাপূজা। এখানে দেবী দুর্গার সাথে গণপতি, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নবপত্রিকা, দেবতাদের সকল বাহন এমনকি মহিষাসুরও পূজিত হন। বাংলার ধর্মীয় দর্শন যে সমন্বয়বাদী–তার আরেকটি দৃষ্টান্ত এই দুর্গাপূজা। এখানে দেবী দুর্গাকে কুমারী রূপেও পূজা করা হয়। পূজার বিধি দেখলেই বোঝা যাবে বাঙালির কাছে দেবী দুর্গা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিদিন পূজায় দেবীর প্রতীকি বস্তুকে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা মহাস্নান করানো হয়। অর্ঘ্য, নৈবেদ্য, বস্ত্র, জল, পুষ্প নিবেদন করা হয়। বাঙালির কাছে দেবী দুর্গা ঘরের মেয়ে। পাঁচ দিনের জন্য বেড়াতে এসে আবার ফিরে যাবে কৈলাসে পতি শিবের কাছে। বাঙালির কাছে গণপতি, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী হয়ে ওঠে দেবী দুর্গার ছেলেমেয়ে। যদিও পৌরাণিক বিচারে এটা যথার্থ নয়। দশমী তিথিতে দেবীর মহাস্নান করানো হয় না। এর কারণও বাঙালির বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। আজও বাঙালি মেয়েরা যেদিন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায়, সেদিন স্নান করে যায় না। দশমীর দিনে দেবীর পূজায় দেয়া হয় সেদ্ধ চাল, কচু শাক, শাপলা প্রভৃতি। এসবই বাঙালির প্রাচীন রীতির আলোকে। মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে যাবার সময় যেমন খুব কাঁদে, তেমনি দেবীর বিসর্জনের সময়ও বাঙালির চোখে জল ঝরে। মন্দির থেকে প্রতিমা বের করার সময়ে পুরোহিত কর্তৃক যাত্রামঙ্গল পাঠ করা হয়, ঠিক যেমন বাঙালি নর-নারীর বিবাহের সময় করা হয়ে থাকে।

এই দুর্গাপূজা বাংলায় বহু আগে থেকেই প্রচলিত। শারদীয় দুর্গাপূজা তথা অকালবোধন বাংলায় কয়েক হাজার বছর আগের। নবম শতাব্দীতে নির্মিত একাধিক মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন বলা হলেও প্রাচীন গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায় দশম অথবা একাদশ শতকেও দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ সেটিকেই জাঁকজমকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

আগে দুর্গাপূজা ব্যক্তিগতভাবে করা হতো। এরপর এটি সর্বজনীনভাবে শুরু হলো। সেই ধারা আজও বহমান। অশুভ শক্তির বিনাশ, দুর্গতি দূর করা এবং মোক্ষলাভের জন্য প্রতিবছর সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। এই শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালির সংস্কৃতির সাথে সেই প্রাচীনকাল থেকেই জড়িয়ে আছে বিধায় আজ এটি বাঙালির বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। মিথোলজির নানা ঘটনা, বিশ্বাস সংস্কৃতি সবকিছুর সমন্বিত রূপ এই দুর্গাপূজা।

সুদেব চক্রবর্তী
প্রাবন্ধিক

তথ্য সহায়িকা

১. বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন/অতুল সুর
২. শ্রীশ্রী চণ্ডী/স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত
৩. দুর্গাপূজার ইতিকথা/গোপালচন্দ্র মিশ্র

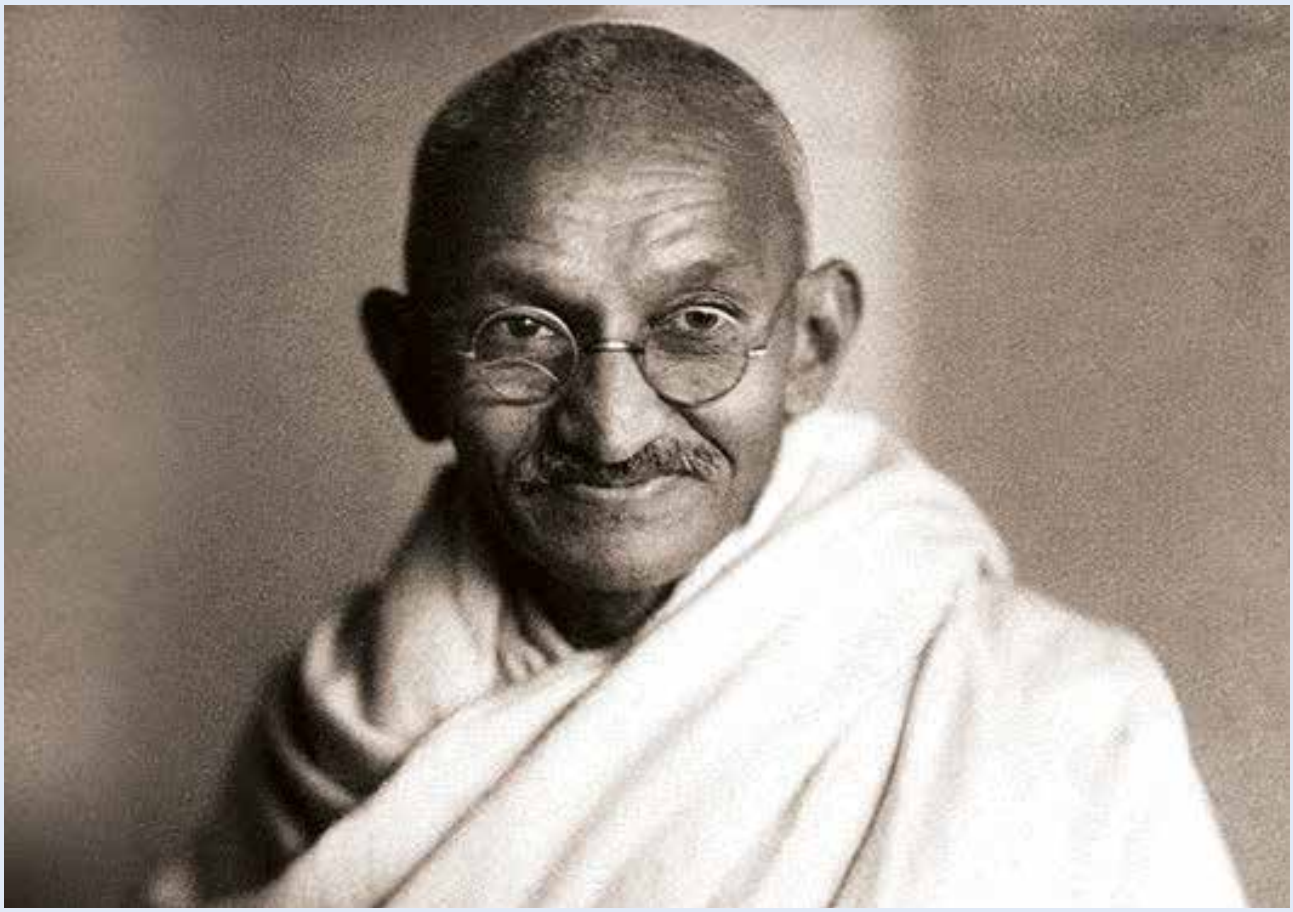

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (২ অক্টোবর ১৮৬৯ – ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায়
স্বচ্ছতা এবং এর প্রাসঙ্গিকতা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতীয়রা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, কিন্তু তাঁর একটি পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ। অবশ্য ভারত সরকার দ্বারা প্রচলিত একটি জাতীয় প্রকল্প হিসেবে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' (২০১৪) ইতোমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালে লিখেছিলেন, 'গত চার বছরে (২০১৪-২০১৮) ১৩০ কোটি ভারতীয় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রত্যেক ভারতীয়ের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে আজ স্বচ্ছ ভারত অভিযান চার বছর পূর্ণ করেছে এবং এই অভিযান এক গতিশীল ও সুফলদায়ী প্রশংসনীয় গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সারা দেশের সাড়ে আট কোটিরও বেশি পরিবারে বর্তমানে শৌচালয়ের সুবিধা রয়েছে। ৪০ কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিককে আর প্রকাশ্যে মলত্যাগ করতে হয় না। চার বছরের এই ক্ষুদ্র সময়ে দেশে পরিচ্ছন্নতার সুবিধা ৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে

গান্ধীজি ৪৬ বছর বয়সে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। সেই বছর হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় যাওয়ার সময়, তিনি তাঁর ছেলেদের সাথে মেলায় ভাঙ্গি হিসেবে সেবা প্রদান করেন। একই বছর গান্ধী পুনাতে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন। ছোট কলোনির সদস্যরা একদিন সকালে তাকে ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে দেখেছিল। তারা এটা পছন্দ করেনি

একুশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সাড়ে চার লক্ষ গ্রামকে বর্তমানে প্রকাশ্যে মলত্যাগহীন স্থানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।' দৃশ্যত গান্ধীজির ভাবনা ও কর্মের অনুপ্রেরণা 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র অন্যতম দিক।

তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশনকে গান্ধীবাদী জীবনযাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল সবার জন্য সম্পূর্ণ স্যানিটেশন। শারীরিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি জনসাধারণের এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির ওপর প্রভাব ফেলে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং দুর্বল স্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। অল্প বয়সে শেখা অভ্যাসগুলো একজনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে গেঁথে যায়। খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা এবং অল্প বয়স থেকেই স্নান করার মতো কিছু অভ্যাস গড়ে তুললেও আমরা দেশের পাবলিক প্লেস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে মাথা ঘামাই না।

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমি কাউকে তাদের নোংরা পা দিয়ে আমার মনের মধ্যে দিয়ে যেতে দেব না।' গান্ধীজি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ভালো অভ্যাসে গড়া জীবন নিয়ে বাস করতেন এবং সুস্বাস্থ্যের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করেছিলেন। কেউ রাস্তায় থুথু বা নাক পরিষ্কার করবেন না। কিছু ক্ষেত্রে, থুথু এতটাই ক্ষতিকর যে জীবাণুগুলো অন্যদের সংক্রমিত করে। কিছু দেশে রাস্তায় থুথু ফেলা একটি ফৌজদারি অপরাধ। যারা পান ও তামাক চিবিয়ে থুথু ফেলেন তাদের অন্যের অনুভূতির প্রতি কোনো বিবেচনা থাকে না। থুথু, নাক থেকে শ্লেষ্মা ইত্যাদিও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। (নবজীবন তারিখ ২ নভেম্বর ১৯১৯)

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীর দ্বিতীয়বার ভারত সফরটি ছিল তাৎপর্যবহ। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবিধানের জন্য কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ক্যাম্পের স্যানিটারি অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কিছু প্রতিনিধি তাদের কক্ষের সামনের বারান্দাকে ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করেন, অন্যরা এতে আপত্তি করেননি। গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বললে তারা বললেন, 'এটি আমাদের কাজ নয়, এটি একজন ঝাড়ুদারের কাজ।' সেসময় গান্ধী একটি ঝাড়ু চেয়ে ময়লা পরিষ্কার করেছিলেন। তখন তিনি পশ্চিমা পোশাক পরিহিত। স্বেচ্ছাসেবকরা অবাক হয়েছিলেন কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। কয়েক বছর পরে, যখন গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পথপ্রদর্শক ও নেতা, স্বেচ্ছাসেবকরা কংগ্রেস ক্যাম্পে একটি ভাঙি (ঝাড়ুদার) স্কোয়াড গঠন করে যেখানে একসময় ব্রাহ্মণরা ভাঙ্গি হিসেবে কাজ করেছে। হরিপুর কংগ্রেসে ময়লা ফেলার জন্য দুই হাজার শিক্ষক ও ছাত্রকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। নোংরা এবং ময়লা পরিষ্কার করার জন্য একদল লোককে অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করার কথা গান্ধীজি কখনো ভাবতে পারেননি। তিনি ভারতে অস্পৃশ্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন। গান্ধী যখনই একটু পরিচ্ছন্নতার কাজ করার সুযোগ পেতেন, তখনই তিনি খুশি হতেন। তার কাছে, জনগণের পরিচ্ছন্নতার মান পরীক্ষা ছিল তাদের ল্যাট্রিনের অবস্থা। তিনি নিজেকে একজন ভাঙ্গি হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ঝাড়ুদার হিসেবে মরতে পারলে সন্তুষ্ট হবেন। এমনকি তিনি গোঁড়া হিন্দুদেরকে অস্পৃশ্যদের সাথে সামাজিক বয়কটে সহানুভূতি দেখাতে বলেছিলেন।

গান্ধীজি ৪৬ বছর বয়সে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। সেই বছর হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় যাওয়ার সময়, তিনি তাঁর ছেলেদের সাথে মেলায় ভাঙ্গি হিসেবে সেবা প্রদান করেন। একই বছর গান্ধী পুনাতে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন। ছোট কলোনির সদস্যরা একদিন সকালে তাকে ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে দেখেছিল। তারা এটা পছন্দ করেনি। কিন্তু গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে এই ধরনের কাজ স্বরাজের জন্য যোগ্যতম। একাধিকবার তিনি সারা ভারত সফর করেছেন। যেখানেই এবং যখনই তিনি যেতেন, তিনি কোনো না কোনো আকারে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখতে পান।

তিনি বলেছিলেন, যদিও খুব কম লোকই জুতা কিনতে পারে, ভারতে খালি পায়ে হাঁটা কল্পনা করা যায় না। এমনকি বোম্বাইয়ের মতো শহরে, আশপাশের বিল্ডিং দখলকারীদের দ্বারা থুথু ফেলার ঘটনা ছিল দুঃখজনক। রেলস্টেশন এবং ধর্মশালায় পাবলিক শৌচাগারগুলোর নোংরা এবং দুর্গন্ধ ছিল ভয়াবহ। গান্ধী রেলের বগি নোংরা করা যাত্রীদের অভ্যাসের নিন্দা করেছিলেন।

দরিদ্র গ্রামবাসীদের ব্যবহৃত রাস্তা এবং তাদের গৃহপালিত ষাঁড়গুলো সর্বদা খারাপ অবস্থায় রাখা হতো। স্নানের জায়গা বা জল কতটা নোংরা তা না জেনে তিনি মানুষকে তথাকথিত পবিত্র পুকুরে ডুব দিতে দেখেছেন। তারা নিজেরাই নদীর পাড় নোংরা করেছে। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মার্বেল মেঝেতে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে ময়লা সংগ্রহ করা দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন কেন মন্দিরের প্রবেশদ্বারগুলো সরু পিচ্ছিল গলি দিয়ে করা হয়। পৌরসভার সাথে আলাপকালে গান্ধী প্রায়ই বলতেন, 'আমি আপনাকে আপনার প্রশস্ত রাস্তা, আপনার দৃষ্টিনন্দন আলো এবং আপনার সুন্দর পার্কগুলোর জন্য অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এমন একটি পৌরসভার অস্তিত্বের যোগ্য নয় যেখানে পানীয় জলের কল নেই এবং যেখানে দিনরাত সব সময় রাস্তা ও গলি পরিষ্কার রাখা হয় না। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে ঝাড়ুদাররা কী অবস্থায় থাকে?'

গান্ধীজি জোর দিয়েছিলেন যে ভৃত্যদের ঘরগুলো প্রভুদের বাংলোর মতো পরিষ্কার হওয়া উচিত। 'এটা বলে লাভ নেই যে আমরা ইংরেজদের মতো বাহ্যিক স্যানিটেশনের শিল্প শিখিনি। খুবই কষ্টের বিষয় হলো ভাইসরয় হাউজে নিয়োজিত নিচুজাতের ঝাড়ুদারদের বাসস্থান অত্যন্ত নোংরা।' এই অবস্থা আমাদের নতুন সরকারের মন্ত্রীরা সহ্য করবেন না। যদিও তারা একই সুসংরক্ষিত বাংলো দখল করবে, তবে তারা দেখবে যে তাদের ভৃত্যদের বাসস্থান তাদের নিজেদের মতো পরিষ্কার রাখা হয়েছে।

কর্মীদের স্ত্রী ও সন্তানদের পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাদের নজর দিতে হবে। জওহরলাল এবং সর্দার তাদের নিজস্ব শৌচাগার পরিষ্কার করতে কোনো আপত্তি নেই। কিভাবে তারা তাদের পরিচারকদের থাকার ঘর পরিষ্কার করতে পারে? জওহরলালের এক সময়ের হরিজন সেবক এখন ইউপি অ্যাসেম্বলির সদস্য। আমি তখনই সন্তুষ্ট হব যখন মন্ত্রীদের কর্মীদের থাকার জায়গাগুলো তাদের নিজেদের মতো পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন হবে।'

গান্ধীজি বলেছিলেন, 'যতদিন আপনি ঝাড়ু এবং বালতি হাতে না নেবেন, আপনি আপনার গৃহ এবং শহরগুলোকে পরিষ্কার করতে পারবেন না।'

তিনি যখন একটি মডেল স্কুল পরিদর্শন করেন, তখন তিনি শিক্ষকদের বলেছিলেন : 'আপনারা আপনার প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ করে তুলবেন, যদি ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আপনি তাদের রাধুনি এবং ঝাড়ুদার তৈরি করেন।' ছাত্রদের উদ্দেশ্যে, তাঁর পরামর্শ ছিল, 'তুমি যদি নিজের মেথর হও, তবে তুমি তোমার চারপাশকে পরিষ্কার করবে। ভিক্টোরিয়া ক্রস জেতার চেয়ে একজন বিশেষজ্ঞ মেথর হওয়ার জন্য কম সাহসের প্রয়োজন নেই।'

তাঁর আশ্রমের কাছের গ্রামবাসীরা মাটি দিয়ে মলমূত্র ঢেকে দিতে অস্বীকার করে। তারা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই এটা ভাঙ্গির কাজ।' গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে গ্রামে ময়লার কাজ তদারকি করতেন। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি কয়েক মাস ধরে বালতি, ঝাড়ু নিয়ে গ্রামে গ্রামে যেতেন। বন্ধু ও অতিথিরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা বালতিভর্তি ময়লা ও মল এনে গর্তে পুঁতে দিতেন। তাঁর আশ্রমে সমস্ত ময়লা পরিচ্ছন্নতার কাজ বাসিন্দারা করত। গান্ধী তাদের পথ দেখান। সেখানে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করত। তাঁর আশ্রমের মাঠে কোথাও কোনো দিন কোনো ময়লা পাওয়া যায়নি। সমস্ত আবর্জনা সবজির খোসার গর্তে পুঁতে দেওয়া হতো এবং অবশিষ্ট খাবার সারের জন্য একটি পৃথক গর্তে ফেলে দেওয়া হতো। মলও পুঁতে দেওয়া হতো পরে সার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। বাগান করার জন্য ব্যবহৃত হতো ব্যবহৃত বা দূষিত জল। কোনো পাকা নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকলেও আশ্রমের খামারটি মাছি ও দুর্গন্ধমুক্ত ছিল।

গান্ধী এবং তাঁর সহকর্মীরা পালাক্রমে ঝাড়ুদারের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি বালতি ল্যাট্রিন এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ট্রেঞ্চ ল্যাট্রিন চালু করেন। গান্ধী গর্বসহ দর্শনার্থীদের কাছে এই নতুন উদ্ভাবনটি দেখিয়েছিলেন; ধনী-গরিব, নেতা-কর্মী, ভারতীয় ও বিদেশি সবাইকে এই ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হতো। এই পরীক্ষাটি ধীরে ধীরে গোঁড়া সহকর্মী এবং আশ্রমের মহিলা বাসিন্দাদের মন থেকে ময়লা সংগ্রহকারী সম্পর্কে সংস্কার সরিয়ে দেয়। মলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ভাঙ্গিকে দেখলে তিনি অস্বস্তিতে পড়তেন, অসুস্থ বোধ করতেন।

তিনি স্বচ্ছতাকে ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। ময়লা সংগ্রহ একটি সূক্ষ্ম শিল্প এবং তিনি নিজে নোংরা না হয়ে এটি করেছিলেন।

তিনি লিখেছেন, 'গ্রামের পুকুরগুলি স্নান, জামাকাপড় ধোয়া এবং পানীয় এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক গ্রামের পুকুর গবাদি পশুদের দ্বারাও ব্যবহার করা হয়। মহিষগুলিকে প্রায়শই তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, পুকুরের জলের এই অপব্যবহার সত্ত্বেও গ্রামগুলি মহামারি দ্বারা ধ্বংস হয়নি। অথচ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ দেখায় যে গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অভাব গ্রামবাসীদের অনেক রোগের জন্য দায়ী।' (হরিজন, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)

মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের প্রথম দিকে উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন বৃহত্তর গ্রামীণ ভারতে স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতার বিরাজমান শোচনীয় অবস্থা বিশেষত পর্যাপ্ত টয়লেটের অভাব স্বরাজ অর্জনের পথের কাঁটা। তিনি বলেছিলেন, যতক্ষণ না আমরা 'আমাদের নোংরা অভ্যাস থেকে নিজেদেরকে পরিত্রাণ না করি এবং ল্যাট্রিন উন্নত না করি, ততক্ষণ আমাদের জন্য স্বরাজের কোনো মূল্য থাকতে পারে না।' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় (১৮৬৯-১৯৪৮) দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের মুক্তির লড়াই এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে, স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্নতা এবং সমস্ত শ্রেণির বর্জ্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অবিরাম সংগ্রামের

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্যানিটেশনের প্রযুক্তিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক-এবং এর ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও কর্পোরেটের প্রায় সমস্ত দিক নিয়ে কাজ করেছেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরপরই গান্ধী শহিদ হন। স্বাধীনতার পর বিক্ষিপ্তভাবে স্যানিটেশনের বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর পরিচ্ছন্নতার ধারণাগুলোর আরও প্রসারিত বাস্তবায়ন দরকার। তিনি বলেছিলেন যে মশা এবং মাছির মতো এজেন্টরা রোগ ছড়ায় এবং আমরা নিজেরাই বোম্বাইয়ের খারাপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিনি সকলকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলেন 'ময়লা পরিষ্কার করা এবং স্বরাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।' তিনি বলেছিলেন, 'মহামারির জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা অযৌক্তিক।' গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত যেখানে 'কর্পোরেট স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি অনুভূত হয় না'–সেখানে 'পশ্চিম থেকে পৌর স্যানিটেশনের বিজ্ঞান' আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। অবশ্যই 'আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে স্যানিটেশনের পশ্চিমা পদ্ধতিগুলি সংশোধন করতে হবে।' মানুষের মলমূত্রকে 'মূল্যবান সার'-এ রূপান্তরিত করে কাজে লাগানোর সবচেয়ে সস্তা এবং কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজেই ডাঃ পুরের কাছে ঋণী ছিলেন। ইংরেজদের মতো, তিনি ময়লাকে 'ম্যাটার ডিসপ্লেসড' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তিনি নিজেকে একজন 'ময়লা সংগ্রহকারী' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'পৌরসভার পরিষেবাকে উপেক্ষা করা আমাদের জনজীবনের একটি প্রবণতা' বলে নিন্দা করেছিলেন।

তিনি মাদ্রাজের শ্রমিকদের উন্মাদনা, নোংরামি এবং রোদ-বাতাসহীন নোংরা বাড়িতে বসবাস ত্যাগ করতে বলেছিলেন। একটি 'শৌচাগার একটি ড্রয়িংরুমের মতো পরিষ্কার হতে হবে।' ষোলো জায়গায় মলত্যাগ শুধু নির্জন স্থানে মাটিতে খনন করা গর্তে করা যেতে পারে এবং ল্যাট্রিনে একটি কমোড ব্যবহার করা দরকার। তিনি 'পশ্চিম থেকে এটি শিখেছিলেন।' তিনি 'একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন' বলে দাবি করেছিলেন এবং ফিনিক্স সেটেলমেন্টে (দক্ষিণ আফ্রিকা) মলকে জৈব সারে রূপান্তরিত করার পরীক্ষা করেছিলেন এবং সবরমতী আশ্রমে এই পদ্ধতিটি চালিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে 'পুরনো কুসংস্কার এবং পুরানো অভ্যাস'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, টেকসই শিক্ষা এবং আইন প্রণয়ন অপরিহার্য।

'আমাদের উন্মাদনা' শিরোনামে একটি লেখায় তিনি বলেছিলেন, বেশ কয়েকটি রোগের প্রকোপ সরাসরি উন্মাদনার সাথে শনাক্ত করা যেতে পারে এবং 'স্বরাজ কেবল সাহসী এবং পরিচ্ছন্ন লোকদের দ্বারাই হতে পারে।'–'একটি পরিষ্কার শরীর একটি অপরিষ্কার শহরে বাস করতে পারে না।' 'পরিচ্ছন্নতাই ধার্মিকতা।' তিনি চেয়েছিলেন স্যানিটারি অ্যাসোসিয়েশনগুলো নোংরা পরিষ্কার করার জন্য 'ঝাড়ু, বেলচা এবং বালতি' গ্রহণ করুক। আমাদের চারপাশ নোংরা করে আমরা গীতার শিক্ষা লঙ্ঘন করি। ময়লা স্থানচ্যুত পদার্থ, যেমন মানুষের মলমূত্রকে 'সোনার সারে' রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং একটি শহরের চওড়া ও পরিষ্কার রাস্তা উন্নত স্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল এবং ভালো কিছুর মাধ্যমে 'একটি অর্থনৈতিক লাভ' সম্ভব। এমনকি তিনি বলেছিলেন, 'যেখানে নোংরামি, কলঙ্ক এবং দুঃখ সেখানে কোন সঙ্গীত হতে পারে না।'

মায়াভরমে একজন নারীকে দুর্গন্ধভরা পুকুর থেকে তার পাত্র ভর্তি করতে দেখে তিনি লিখেছিলেন, 'যেকোনো পৌর জীবনের প্রথম শর্ত হলো শালীন স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অবিরাম সরবরাহ।' তিনি স্মরণ করেন কিভাবে তার জন্মস্থানে একজন ইংরেজ প্রশাসক একদিনে রাস্তা থেকে 'ভয়ংকরভাবে অশুদ্ধ গোবরের স্তূপ' সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মূলত দৈনিক স্নান এবং আমাদের ঘর পরিষ্কার রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং, আমাদের গ্রামগুলো গোবরের স্তূপ, আমাদের রাস্তাগুলো হাঁটার অযোগ্য, এবং আমাদের নদীগুলো অপরিষ্কার। কৃষ্ণা নদী পার হওয়ার সময় তিনি শত শত লোককে তীরের কাছে মলত্যাগ করতে দেখেন কিন্তু একই স্রোত থেকে স্নান ও পানীয় জল গ্রহণ করতেও দেখা যায় সেখানে। তিনি বলেছিলেন, মলকে সারে রূপান্তরিত করা 'একটি অর্থনৈতিক বর্জ্য' এবং 'জাতীয় স্যানিটেশন সংরক্ষণ স্বরাজের কাজ।' স্যানিটেশনের এই সংস্কার শেষ পর্যন্ত অর্থকরী হয়ে উঠেছিল। হরিদ্বার সম্পর্কে, তিনি বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে 'চিন্তাহীন অজ্ঞ' লোকেরা এমনকি পবিত্র নদীগুলোকেও অপবিত্র করেছে এবং 'ধর্ম, বিজ্ঞান এবং স্যানিটেশন আইন লঙ্ঘন করেছে।' তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে ল্যাট্রিন এবং রান্নাঘর 'একই কাজের বিভিন্ন দিক' এবং বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন কীভাবে দুটি গর্ত তৈরি করতে হবে এবং এগুলোকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে শৌচাগার থেকে সারে রূপান্তরিত করার জন্য।

তিনি সম্ভবত প্রথম নেতা যিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের দায়িত্ব ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য এবং কর্পোরেট স্তরে সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি এমনকি বলেছিলেন, আমরা যদি 'আমাদের নোংরা অভ্যাস থেকে নিজেকে পরিত্রাণ না করি এবং ল্যাট্রিন উন্নত না করি, আমাদের জন্য স্বরাজের কোন মূল্য থাকতে পারে না।' তিনি বর্জ্য বা ময়লাকে 'বস্তু স্থানচ্যুত' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এবং অবিচল ছিলেন যে, যতদূর সম্ভব, সমস্ত বর্জ্যকে দরকারি সম্পদ হিসেবে যথাযথভাবে পুনর্ব্যবহৃত করা উচিত।

এভাবে, তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত মানুষের বর্জ্য, গোবর, আবর্জনা এবং অন্যান্য জৈব-ক্ষয়যোগ্য বর্জ্য 'সোনার মতো' সারে রূপান্তরিত হোক। তিনি স্যানিটেশনের সমস্ত দিকগুলোতে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে সমর্থন করেছিলেন এবং স্যানিটেশনের বিষয়ে পশ্চিমের কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন ছাত্র হিসেবেও 'পরিচ্ছন্নতা ধার্মিকতার পাশে' গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে এটিকে 'পরিচ্ছন্নতাই ধার্মিকতা'য় পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে তার অনুসারীরা প্রতিরোধযোগ্য রোগ, ভুল ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য হিসেবে মূল্যবান সম্পদের ক্ষতির মতো উপায়গুলোর মাধ্যমে ঘটে যাওয়া 'অর্থনৈতিক অপচয়ের পুরো বিষয়' গ্রহণ করুন। তিনি ময়লা ফেলার কাজটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন, এমনকি একজন মা তার সন্তানের জন্য যা করতে পারেন তার চেয়েও উচ্চতর।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলোর পাশাপাশি কিছু বেসরকারি সংস্থা, বিশেষ করে ড. বিন্দেশ্বর পাঠকের সুলভ ইন্টারন্যাশনাল, ভারতে স্যানিটেশন বিপ্লবের কাজ করছে। সরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে, যা অবশ্যই জনজীবনে প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু চাহিদা ক্রমবর্ধমানভাবে বেশি। গান্ধীজি ১৯১৫ সালে ভারতে স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তখন থেকে ভারতের জনসংখ্যা ৭ থেকে ৮ গুণ বেড়েছে, ভারতীয় সমাজ ক্রমবর্ধমানভাবে নগরায়ণ হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামো আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে এবং উন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক মানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই, স্যানিটেশনের অভাব এবং বর্জ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর জটিলতা বাড়ছে। অবশ্য 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' (২০১৪) পরিচ্ছন্নতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আগেই বলা হয়েছে, গান্ধীজির সবরমতী আশ্রম যেসব ইতিহাসের সাক্ষী তার সঙ্গে নৈমিত্তিক পরিচ্ছন্নতার একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেখানে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কোনোরকম সমঝোতা করা হতো না।

সবরমতী আশ্রম থেকে প্রেরণা নিয়ে আজ পরিচ্ছন্নতাই ভারতীয়দের স্বভাব হয়ে উঠেছে। তাদের শিরা ও ধমনিতে, অস্তিত্ব ও ভাবনায়, আচার-আচরণে পরিচ্ছন্নতা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। গান্ধীজি বলতেন, স্বাধীনতা ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে তাঁর প্রথম পছন্দ পরিচ্ছন্নতা। তার মানে তিনি স্বাধীনতাকে অপরিচ্ছন্নতার হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এই অগ্রাধিকার ছিল মনোজগতের বিষয়। তিনি সুন্দর মন, সুস্থ চিন্তার পূজারি ছিলেন। আর এখানেই তাঁর স্বচ্ছতার ধারণা মহিমান্বিত।

(মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাস্থ ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারে পঠিত ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণ) •

ড. মিল্টন বিশ্বাস
বঙ্গবন্ধু গবেষক, কবি, কলামিস্ট
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মৃত্যুশতবর্ষ

ব্যতিক্রমী এক দীপ্যমান

সুকুমার রায়

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি উক্তি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে, শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায় একটি ব্যতিক্রমী দীপ্যমান প্রতিভা যা তাঁর আগেও ছিল না এবং এখনও নেই। তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ আলাদা যাকে বলা হয় 'আউট অব বক্স'। ব্যতিক্রমী প্রতিভা ছাড়া কখনও 'আউট অব বক্স' হওয়া যায় না এবং নতুন পথও সৃষ্টি করা যায় না। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, 'সুকুমার রায়ের মতো হাস্যরসিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসি, ইংরেজি, জর্মন সাহিত্যেও নেই। রাশানে আছে বলে শুনিনি। এ-কথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হলো, কারণ আমি অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে নিয়েছি। একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিহেলম বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়–স্ব-শ্রেণি না হলেও ঠিক সুকুমারের মতো তিনি অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন

তাই তিনিও সুকুমারের মতো আপন লেখার ইলাস্ট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইউরোপে অভূতপূর্ব, সে-কথা 'চরুয়া' ইংরেজ ছাড়া সবাই জানে।'

কে এই সুকুমার রায়? কী তাঁর কীর্তি? সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সুকুমার রায় তো আমাদেরই ঘরের মানুষ। আমাদেরই দেশের মানুষ। তাঁর শিকড় তো বাংলাদেশেই। এই তো ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলায়। তার আগে তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোরী রায়চৌধুরী সম্পর্কে সামান্য জেনে নেওয়া দরকার। না-হয় সুকুমার রায়ের শিকড়ের সন্ধান করা নিরর্থক হবে; তথ্যগত বিভ্রান্তিও ছড়াতে পারে।

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসুয়া গ্রামে ১৮৬৩ সালে ১০ মে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন একজন শানিত প্রতিভার কীর্তিমান পুরুষ যাকে বাদ দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব, আর তিনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় যে, তিনিই বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। উপেন্দ্রকিশোর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনকার সময় ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রাস (১৮৮০) পরীক্ষায়। এরপর কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ পাস (১৮৮৪) করেন তিনি। তারপর ছোটোদের জন্য লিখেছেন গল্প, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কবিতা, গান এবং এঁকেছেন ছবি। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রকাশিত হতো। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নিজেই নিজের বইয়ের ছবি আঁকতেন। প্রতিভাবান এই শিশুসাহিত্যিকের পুত্র সুকুমার রায়ও শিশুসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। আমাদের অনেকের অজানা যে, সুখলতা রাও একজন বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসেবী–উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। প্রসঙ্গত, উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র অর্থাৎ সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়–যিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর প্রকাশনাশিল্পের পথিকৃৎ হিসেবে প্রেস স্থাপন করে প্রকাশনার কাজ করেন। তাঁর আরও প্রতিভার মধ্যে ছিল যে তিনি বেহালা বাজাতেন এবং শখের জ্যোতির্বিদ ও সুরকার ছিলেন। তিনি 'সন্দেশ' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং পরবর্তী সময় তাঁর পুত্র সুকুমার রায় ও পৌত্র সত্যজিৎ রায়ও একই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। উল্লেখ্য যে, সুকুমার রায়ের ঠাকুরদাদা আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। গোপী গাইন বাধা বাইন ও টুনটুনির বই উপন্দ্রেকিশোর রায়চৌধুরীর অমর সৃষ্টি। কিশোরগঞ্জের বিরল প্রতিভার উপেন্দ্রকিশোর দেশভাগের আগেই কলকাতায় পাড়ি জমান। তাঁরা ছিলেন চার ভাই, সবাই ছিলেন প্রাজ্ঞ ও প্রতিভাবান ও নানা গুণে গুণান্বিত। মোদ্দাকথা, এই পরিবারের ইতিহাসে কেবল বিস্ময়কর প্রতিভারই সন্ধান পাওয়া যায়। 'সন্দেশ' পত্রিকাটি এক সময় তাঁদের পরিবারের সদস্যরাই লিখে ভরে ফেলতেন যেটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাহিত্যপত্রিকা।

তাহলে কি এবার অনুমান করা যেতে পারে 'রায় পরিবার'টি কেমন প্রতিভাবানদের সূতিকাগার ছিল! কলকাতাতেই এই পরিবারটি স্থায়ী বসতি গাড়ল আর বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করল। 'ননসেন্স ছড়া'র প্রবর্তক সুকুমার রায় ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই কীর্তিমান সাহিত্যিক মাত্র ছয়ত্রিশ বছর বয়সে ১৯২৩ সালে ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। এত অল্প বয়সে তিনি যা করেছেন তার তুলনা হয় না। হয়তো দীর্ঘায়ু পেলে বাংলা শিশুসাহিত্য আরও অমূল্য সম্পদ পেত। লেখালিখি ছাড়া ফটোটেকনোলজিতেও তাঁর অসম্ভব পারদর্শিতা ছিল। উপেন্দ্রকিশোরও ফটোটেকনোলজিতে বিলাত থেকে লেখাপড়া করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। আর ছবি আঁকার কথা তো বলাই হয়নি। উপেন্দ্রকিশোর যেমন নিজের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন নিজে করতেন, সুকুমার রায়ও তাই করতেন। হয়তো, জেনেটিকেলি সত্যজিৎ রায় পিতা ও পিতামহের প্রতিভা ধারণ করেন এবং সিনেমার নির্মাতা হিসেবে অবিস্মরণীয় কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারসহ শেষ বয়সে অস্কার পুরস্কারও পান।

বলা হয়ে গেল পরিবারের কথা। তাহলে সুকুমার রায় কি আড়ালে পড়ে যাবেন? না, মোটেও না। স্বল্পায়ু সুকুমার রায়ের যেমন ছড়া তেমনই গল্প, তেমনই নাটকের কৃতিত্বে শিশুদের কাছে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। অল্প কিছু লেখার মধ্য থেকেও প্রায় সবকটা লেখাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

স্ত্রী সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে সুকুমার রায়

পাঠ্যবইয়ে স্থান পায়, এটি সাধারণ কোনো কথা নয়। লেখার গুণেই স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা শৈশবে ও কৈশোরে সুকুমার রায় দিয়েই তো শুরু করেছি সাহিত্যের রস-আস্বাদন। এমন মজার সাহিত্য তখন কি আর পেতাম। এখন, আমরা মনে করি সুকুমার রায়ের সাহিত্য শিশুদের পড়া অত্যন্ত জরুরি। কেন প্রয়োজন তার একটি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও আলোচনা হওয়া দরকার।

শিশুসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিশুদেরকে আনন্দে পড়ার সুযোগ দেওয়া, বই দেওয়া এবং সেইসঙ্গে পঠন-দক্ষতা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ পাঠে অভ্যস্ত করা। তারপর এমন সাহিত্য তাদেরকে পড়তে দেওয়া উচিত যাতে তারা চিন্তার স্পেস পায় ও চিন্তা করতে পারে। এতে শিশুদের চিন্তাশক্তি, বিকাশ অর্থাৎ কগনিটিভ ডোমেইনের বিকাশ সাধিত হয় এবং শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। সুকুমার রায়ের শিশুতোষ ছড়াগুলোতে এই উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে যাতে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে পড়তে পারে এবং চিন্তা করতে পারে। ধরা যাক, 'খিচুড়ি' ছড়াটির কথা। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই ছড়াটিকে বলা হয় 'ননসেন্স ছড়া'। এই ছড়ার মাধ্যমে শিশুদেরকে যে ভাবিয়ে তুলবে অর্থাৎ তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। যখন বলা হচ্ছে : হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),/ হয়ে গেল ''হাঁসজারু'' কেমনে তা জানি না।/বক কহে কচ্ছপে "বাহবা কি ফুর্তি!/অতি খাসা আমাদের খচ্ছপে মূর্তি।" এভাবে ছড়াটিতে দুটি প্রাণীকে একটি প্রাণীর রূপ দেওয়া এবং নিজেই ছবি এঁকে একটি বিস্ময়কর ছড়ার সৃষ্টি করলেন তিনি। এই ছড়া পাঠের মাধ্যমে শিশুরা প্রথমেই ছবি দেখে বিস্মিত হবে, তারা আনন্দিতও হবো। দ্বিতীয়ত ছন্দ ও ধ্বনির কারণে পাঠের মধ্যে গতির সৃষ্টি হবে এবং এই ছড়াটি আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। চিন্তা করবে, ভাববে, কীভাবে হলো এ-রকম প্রাণী? একইসঙ্গে শিশু বয়সে হাসির ছলে অনেকগুলো প্রাণীর নামও শিখতে পারবে। বলে রাখা ভালো যে, শিশুশিক্ষার জন্য ধ্বনি সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বর্তমান শিক্ষাবিদরা মনে করেন এবং ধ্বনির বৈচিত্র্যও মনের অজান্তে আয়ত্ত করতে পারবে। বলে রাখা দরকার যে, বর্তমানে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনেক দেশে নীরব আন্দোলন চলছে। স্বীকার করতে হবে, পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সবকটাই এই ছড়ার মধ্যে নিহিত আছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, সুকুমার রায় অনেক বছর আগে সৃষ্টি করে গেলেও এর গুরুত্ব শিশুদের জন্য কতটুকু!

'ভালো রে ভালো' ছড়ার মধ্যে যে ধ্বনির তাল সৃষ্টি করা হয়েছে সেটিও শিশুদের এক দিকে আনন্দ এবং অন্যদিকে ধ্বনি ও ছন্দের তালে তালে দ্রুত পড়ার কৌশল আত্মস্থ করার উপাদান বিদ্যমান। উল্লেখ করতে হয় যে, শিশু শিক্ষার জন্য রিপেটেড ওয়ার্ড বা পুনরাবৃত্ত শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য, পাশ্চাত্যের শিশুসাহিত্যের অনেক বইয়ে আমরা পৌনঃপুনিক শব্দের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না আমরা অনেকেই জানি না যে, কোন সাহিত্য কোন বয়সের শিশুর জন্য প্রযোজ্য, কোন ধরনের শব্দ বা

বাক্য বিন্যাসের প্রয়োজন। পুনরাবৃত্ত শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পড়তে আগ্রহী করে তোলে যা সুকুমার রায়ের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক আগেই।

'বাবু রাম সাপুড়ে' শিশুতোষ কবিতা হলেও এটি বড়োদের জন্য চিন্তার যোগান দিতে সক্ষম। স্যাটায়ারধর্মী এই কবিতার মূল বক্তব্য হলো ক্ষমতাবানরা এমন মানুষকেই চায় যাদের দাঁত নেই, চোখ নেই, ছুটে নাকো কাটে না; কেবল হুকুম তামিল করে যাওয়ার মানুষ তাদের প্রয়োজন। এ-রকম প্রতিটি ছড়ার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রসদ যা শিশুদের আনন্দের পাশাপাশি শিক্ষার জন্যও অত্যাবশ্যক।

সুকুমার রায়ের গল্পগুলোর আয়তন লক্ষ ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অধিকাংশ গল্পের আয়তন কিন্তু স্বল্প পরিসরের। কেন স্বল্প পরিসরের? গল্পগুলো কেন বড়ো হলো না? এর উত্তর শিশুসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা দিতে পারেন। শিশুদের ধারণ ক্ষমতা কম এবং গল্প আকারে বড়ো হলো সেগুলোর প্রতি পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ-কারণেই স্বল্প পরিসরের অল্প শব্দের গল্প প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের শিশুসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা বয়স উপযোগী টেক্সট তৈরি করে। পঞ্চাশটি শব্দ দিয়ে গল্প শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের গল্প তিন-চার শত শব্দের মধ্যে থেমে যায়। সুকুমার রায়ের গল্পে অল্প শব্দ, চমৎকার বুননের গল্প, আনন্দ দেওয়ার শব্দ এবং সর্বোপরি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যাবলি বিদ্যমান শিশুদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এজন্যই তাঁর লেখা অবশ্যই পাঠ্য।

'অবাক জলপান' শিশুতোষ নাটকটি (নাটিকা বলাটা বেশি যুক্তিসংগত) সুকুমার রায়ের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। শিশুদের জন্য এই নাটকটিতে রয়েছে অসাধারণ কিছু উপাদান; যেমন- একদিকে নাটকটি হাস্যরসপূর্ণ এবং অন্যদিকে রয়েছে শিক্ষার নানা রকম উপাদান। প্রথম উপাদান হলো, শিশুদের শব্দভান্ডার বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রাসমূলক অনেক শব্দ এবং জলের সঙ্গে মিলে এমন কতগুলো যেগুলো সহজেই মনে রাখার মতো। আবার এই নাটকে বিজ্ঞানের সূত্রও সেখানো হয়েছে। যেমন দুই ভাগ হাইড্রোজের আর এক ভাগ অক্সিজেন যোগ করলে জল হয়। এভাবে একটি হাস্যরসের নাটিকার মাধ্যমে শিশুরা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখেও নিল বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয়আশয়।

এই ধরনের নাটক শিশুদের অভিনয় করানো স্কুলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আমরা করি। কারণ, নাটকের মধ্যে শিশুরা অভিনয় শিখতে পারে, শিশুদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, নাটকটি করার সময় তাদের পরিকল্পনা করতে হয়, বিন্যাস করতে হয় ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং একইসঙ্গে কথা বলা ও শুদ্ধ উচ্চারণ শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যে দক্ষতা পরবর্তী সময়ে মানুষের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়–আনন্দ তো আছেই।

এই নাটকটি পড়ার সময় মনে পড়ে তলস্তয়ের 'টারপিন' বা 'শালগম' নাটকটির কথা। 'শালগম' নাটকটি তিন-চার বছরের শিশুদের জন্য উপযোগী। শিশুদের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণী ও পরিবেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে, এসব নাটকের মাধ্যমে আবেগীয় ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা শিশু শিক্ষার উপাদান বা অংশবিশেষ।

স্বীকার করতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, আমাদের পড়া ও পড়ার আনন্দের ভিত গড়ে দেন সুকুমার রায়। শৈশবের পড়ার আনন্দ বড়ো হলেও থেকে যায় এবং সুকুমারের বই দেখলেই পাতা উল্টায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

শেষ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি দিয়ে, 'হাসির কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কান্না এসে পড়ে–এই কথা মনে পড়ে গিয়ে যে হাসির উৎস গেছে অকালেই শুকিয়ে। বাংলাদেশের, বিশেষ করে তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের দুর্ভাগ্য। বইয়ের ঘরে ঢুকলেই হিস্ট্রি, জিয়োগ্রাফি, অঙ্ক, সায়েন্সের বই; স্কুলে স্রেফ ঐ চর্চা; বাপ, কাকা, মেসো, জ্যাঠা–যে কোনো অভিভাবকের সঙ্গে দেখা হোক, আগেই ঐ কথা–এত হেনস্থার মধ্যে যদি-বা একজন তোমাদের মনকে চিনে তার সঙ্গে মিতালি করতে এলেন তো বিধাতা তাঁকে টুপ করে দিলেন সরিয়ে। সুকুমার রায় মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে, সাহিত্যের যে-দিকটি আলোকিত করে তুলেছিলেন, সেদিকটি অন্ধকার করে চলে যান।'

সত্যি কি তিনি একটি আলোর দুয়ার খুলে আবার বন্ধ করে চলে গেলেন। আমার তো মনে হয় তিনি যা রেখে গেলেন সেগুলো বিভা বিকিরণ করে জেগে আছে আমাদের মননে ও আবেগে। সুকুমার রায় চলে যাননি, তিনি বেঁচে আছেন ও বেঁচে থাকবেন।

মোজাম্মেল হক নিয়োগী
প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

(বি.দ্র. দুটি উদ্ধৃতি বিচিত্রপত্র, সুকুমার সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২৩ থেকে সংগৃহীত)

ঘটনাপঞ্জি ❖ অক্টোবর

প্রতিভা বসু

০১ অক্টোবর ১৯০৬ ❖ শচীন দেব বর্মনের জন্ম
০২ অক্টোবর ১৮৬৯ ❖ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
০২ অক্টোবর ১৯০৪ ❖ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম
০৫ অক্টোবর ১৮৬৮ ❖ অসমীয় লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম
০৮ অক্টোবর ১৯৩৬ ❖ মুন্সি প্রেমচাঁদের মৃত্যু
১০ অক্টোবর ১৯১৬ ❖ কবি সমর সেনের জন্ম
১৩ অক্টোবর ১৯১১ ❖ অভিনেতা অশোককুমারের জন্ম
১৩ অক্টোবর ২০০৬ ❖ প্রতিভা বসুর মৃত্যু
১৪ অক্টোবর ১৯৩০ ❖ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম
১৪ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১৫ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ এপিজে আবদুল কালামের জন্ম
১৮ অক্টোবর ১৯৫০ ❖ অভিনেতা ওম পুরীর জন্ম
১৯ অক্টোবর ১৯২৪ ❖ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম
২২ অক্টোবর ১৯৫৪ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু
২৩ অক্টোবর ২০১২ ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু
২৮ অক্টোবর ২০০২ ❖ অন্নদাশঙ্কর রায়ের মৃত্যু
৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ ❖ সুকুমার রায়ের জন্ম
৩১ অক্টোবর ১৯৭৫ ❖ শচীন দেব বর্মনের মৃত্যু
৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ❖ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু

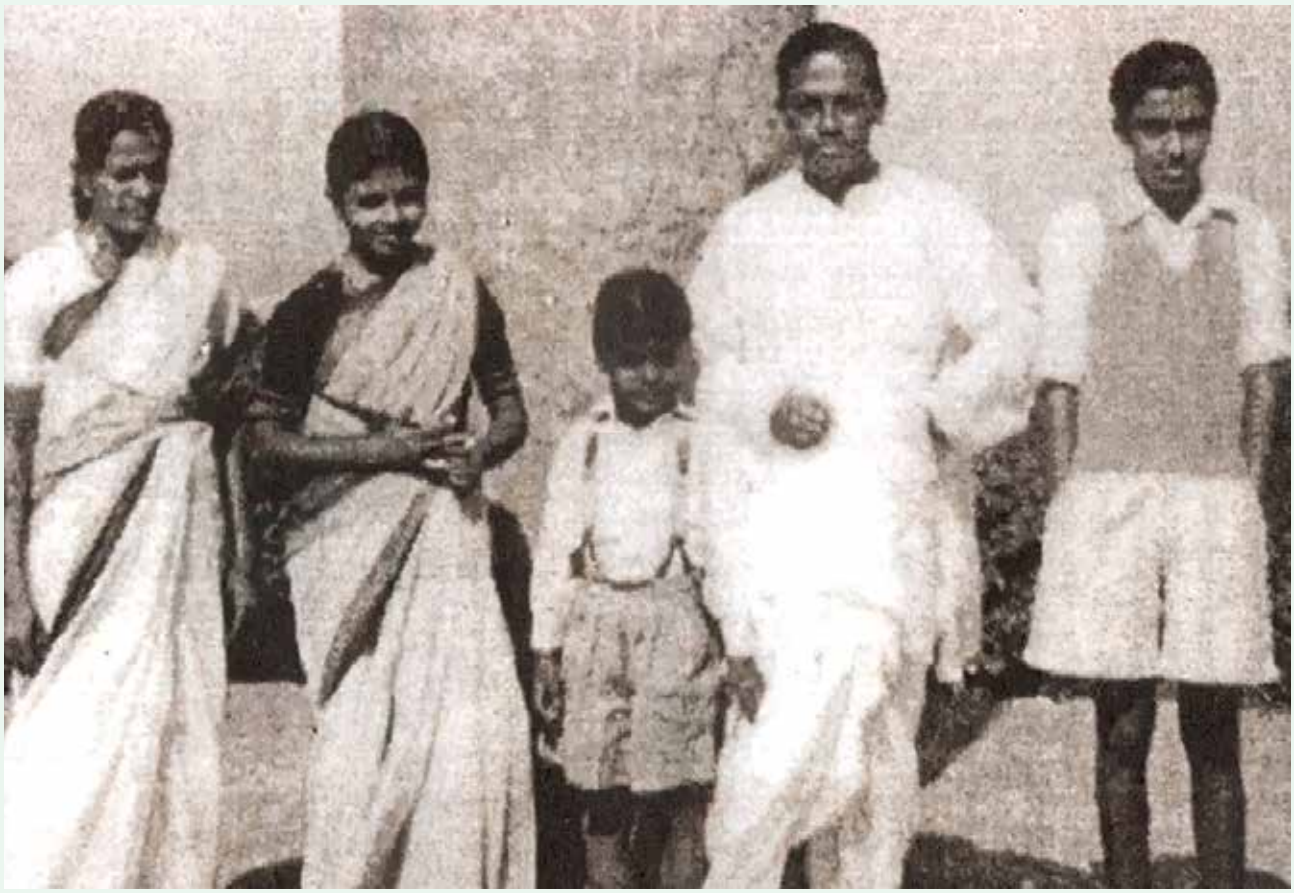

দিল্লির রাজঘাটে (বাঁ দিকে থেকে) লাবণ্যদেবী, মেয়ে মঞ্জুশ্রী এবং ভাইপো অমিতানন্দ ও ছেলে সমরানন্দের সঙ্গে

প্রবন্ধ

জীবনানন্দ ও লাবণ্য দাশ

মুহম্মদ মতিউল্লাহ্

লাবণ্য দাশ ১৯৩০ সালের ৯ মে, 'শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে' জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আপন ভাগ্যকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, জীবনানন্দের জটিল অবিন্যস্ত অসরলতায় ভরা কবিজীবনের সঙ্গে। যদিও 'কবির কবিত্বশক্তির কোন পরিচয়' তখনও জানতেন না লাবণ্য। শুধু পরিচিত হয়েছিলেন দিল্লির রামযশ কলেজের অধ্যাপক হিসেবেই।

লাবণ্য দাশ, প্রকৃত নাম লাবণ্য গুপ্ত, জন্ম ১৯০৯ সালে। বাবা রোহিণীকুমার গুপ্ত, মা সরযু গুপ্ত। অসামান্য রূপসী ছিলেন সরযু গুপ্ত। তেমনি রূপবান রোহিণী গুপ্ত। লাবণ্য দাশ বলেছেন বাবা-মা সম্পর্কে, 'ভগবান আমার বাবা-মা দুজনকে অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।' লাবণ্য দাশ জন্মেছিলেন খুলনার সেনহাটি গ্রামে, এই গুপ্ত পরিবারে। তিন বোন এক ভাই। লাবণ্যর সাত বছর বয়সে বাবা মা দুজনেই মারা যান তিন মাসের ব্যবধানে। বিয়ে হয় যখন, লাবণ্য দাশ তখন, কবিতা সিংহের ভাষায়, 'লম্বা ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে। মুখের গড়ন লম্বা ধাঁচের। উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঠোঁট

বয়স সতেরো আঠারো। ঢাকায় হস্টেলে থেকে পড়ত।' কলেজ পাঠরতা লাবণ্য খুব যে স্বেচ্ছায় বিয়েতে মত দিয়েছিলেন সেদিন, তেমনটি হয়তো নয়। পিতৃমাতৃহীন লাবণ্যের মনে হয়েছিল প্রতিপালক জ্যাঠামশাই তাঁদের দায়িত্বভার কতদিন আর সামলাতে পারবেন! সুতরাং কলেজে পড়াশোনাকালীন সময়েই মত দিতে হয়েছে বিয়েতে। অবশ্য জীবনানন্দ যেরকম অনাড়ম্বর ভাবে কনে দেখতে গিয়েছিলেন, সেটি অবশ্য লাবণ্যর ভালো লেগেছিল। কেননা বিয়ে উপলক্ষে কনে দেখতে আসার যে নানা বিধিবদ্ধতা রীতিনীতি, প্রশ্নপ্রতিপ্রশ্ন এসবের সামাজিক অভিজ্ঞতা লাবণ্যর ছিল। ছিল বলেই অধ্যাপক ভদ্রলোকটির আড়ম্বরহীন দু-একটি প্রশ্নের উত্তরে শান্ত হয়ে বসে থাকাটি পছন্দ হয়েছিল লাবণ্যর। ২৪ বছরের দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে আসে, ১৯৫৪ সালে, দুর্ঘটনায় জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর মুখে এসে। এক কবির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নানা উত্থানপতনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, জীবনযুদ্ধের অনেক ঝড়ঝাপটার ভেতর থাকতে থাকতে কবির জীবনকে কি ভয় পেয়েছিলেন লাবণ্য দাশ? তাই হয়তো অনেক অনেকদিন পর পারিবারিক বন্ধু মিনু সরকারকে সাবধানে থাকতে বলেছিলেন, যখন শোনেন মিনু সরকার যাকে বিয়ে করতে চলেছেন তিনিও একজন কবি।

তাঁদের দাম্পত্য জীবনের টুকরো টুকরো কিছু ছবি আমরা পাই লাবণ্য দাশেরই 'মানুষ জীবনানন্দ' গ্রন্থে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক তিক্ত ছবি ঘোরাফেরা করে জীবনানন্দের বন্ধু পরিজনের মুখে, জীবনানন্দের মৃত্যুর পর থেকে। এবং মৃত্যুর পর জীবনানন্দ বিষয়ে বাঙালি পাঠকের আগ্রহ যেমন বাড়তে থাকে, জীবনানন্দ ভক্তদের কথন অতিকথনও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে, এবং স্বভাবতই নেতিবাচক আলোচনায় বারবার উঠে আসে 'অসংবেদনশীল' লাবণ্য দাশের নাম। জীবনানন্দের পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে বাইরের লোকেদের নানা ভুল তথ্যের স্মৃতিচারণা এতদূর পর্যন্ত এগোয় যে জীবনানন্দ দাশের বোন সুচরিতা দাশকে এর প্রতিবাদ করে জানাতে হয়, 'সাধারণ্যে মনে হচ্ছে একটা ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে কারো কারো দাদা সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ বা স্মৃতিকথায় যা নির্ভেজাল ভুল, যাতে এমনটা বলার চেষ্টা আছে যে দাদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা তেমন গাঢ় ছিল না। ছিল কি ছিল না, সে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকমহল যেকোনো ধারণা করতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় স্মৃতিকথা বা জীবনীতে যেহেতু কল্পনার চাইতে বাস্তব ঘটনার দাবিটা বেশি, তাই যা সত্য তাই বোধ করি লোকের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য।...দাদাকে তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই; যাঁরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন, কিন্তু সেই ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁদের বোধ হয় অন্য কাউকে অহেতুক কল্পনার সাহায্যে সবার কাছে অশ্রদ্ধার্হ করে তোলা উচিত হবে না, অথবা তাদের ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত হবে না সেই সব কথা লেখা যা তাঁরা পুরোপুরি সঠিক করে জানেন না।' লাবণ্য দাশ সম্পর্কে প্রচলিত কথাগুলো সুচরিতা দাশের এই বক্তব্যের আলোকে আমাদের নতুন করে ভাবতে হয়, অতি উৎসাহী জীবনানন্দ ভক্তরা ভক্তির আতিশয্যে লাবণ্য দাশ সম্পর্কে এমন একটি নেতির ইমেজ তৈরি করেছিলেন সেই ধারণাটিও হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। জীবনানন্দ দাশের জীবনের সবচেয়ে বেদনার দিকটি এই যে জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশকাল থেকেই জীবনানন্দ একশ্রেণির লেখক সমালোচক সম্পাদকের উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বারবার চাকরির সন্ধান, বারবার চাকরির চ্যুতি, সামাজিক ভ্রুকুটির শিকার হয়ে অপদস্থ হয়েছেন, বেকারত্বের যন্ত্রণায় দারিদ্র্যের গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন। অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনেও তেমন কোনো পাখির নীড়ের মতো আশ্রয় তাঁর হয়তো ছিল না। জীবনযুদ্ধের সমস্ত প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে, যাবতীয় অভাব অভিযোগে নিরুত্তর থেকে জীবনানন্দ একমাত্র আশ্রয় করেছিলেন তার লেখাকে। তাঁর সময়ে, প্রতিকূলতার অজুহাতে কেউ আর লিখতে পারছেন না এরকম কথা শুনে জীবনানন্দ একবার বলেছিলেন, 'তাহলে ত বলো, আমাকে অনেক আগেই লেখা বন্ধ করা উচিত ছিল। কই, আমি কি তা করেছি।' তা করেননি বলেই তিনি জীবনানন্দ দাশ। তিনি কবি জীবনানন্দ দাশ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু উপযুক্ত স্বামী, উপযুক্ত পিতা কিংবা উপযুক্ত সংসারী হয়ে উঠতে পারেননি। জীবনানন্দ দাশ আশ্রয় করেছিলেন তার লেখার জগতকে, যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে একমাত্র মুক্তির অবলম্বন ছিল তার লেখার জগৎ। অন্যদিকে সহজ সরল মধ্যবিত্ত মানসিকতার নবপরিণীতা লাবণ্য দাশ, শিল্পের জগৎকে নয়,

জটিল মনস্তত্ত্বকে নয়, আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন একজন স্বচ্ছল সংসারী ব্যক্তি হিসেবে জীবনানন্দকেই। এবং হয়তো সেখানেই ধাক্কা খেয়েছেন লাবণ্য দাশ। দিল্লির রামযশ কলেজের অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ বিয়ে করতে ছুটি নিয়ে আসার পর পুনরায় চাকরিতে আর ফিরে যাননি। ফলে বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছে তার একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকা বেকারত্বের জীবন।

বরিশাল থেকে কলকাতা ১৯৩০ থেকে ১৯৫৪ আবর্তিত হয়েছে কবিদম্পতির এই জীবন। প্রকৃতপক্ষে কবির সংসারকে সামাল দেওয়ার জন্যই লাবণ্য দাশও বারবার চাকরির চেষ্টা করেছেন। এবং একাধিক স্কুলে চাকরি নিয়ে সংসার রক্ষা করেছেন। শিক্ষকতার চাকরির জন্য অসুস্থ শরীরেও সংসার সামলে তিনি বিটি ট্রেনিং করেছেন। একটি মহিলা সংসারের হাল ধরতে চাকরির চেষ্টা করছেন সেইকালে, তখনও কিন্তু মহিলাদের চাকরি করা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অধিকার বলে মনে করা হতো না। লাবণ্য দাশের লড়াইটা আলাদা করে আমাদের চোখে পড়েনি। সুমিতা চক্রবর্তী চমৎকার বলেছেন, 'জীবনানন্দপত্নী লাবণ্যপ্রভার টিকে থাকার সংগ্রামকে আবৃত করে রেখেছে জীবনানন্দের কবি প্রতিভার আলোকবলয়। মানুষের সংস্কৃতিতে প্রতিভাবানের এই লাইসেন্স থেকে যাবে চিরকাল। কিন্তু লাবণ্যপ্রভার সংগ্রামের দিকটিও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।' কবি আলোক সরকারের স্ত্রী এবং ভূমেন্দ্র গুহ-র বোন মিনু সরকার ছিলেন দাশপরিবারের পারিবারিক বন্ধু। মিনু সরকার লিখেছেন, 'লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের স্ত্রী আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে জীবনানন্দ বিষয়ে অনেক অভিযোগ শুনেছি। সেই অভিযোগ লাবণ্য দাশের দৃষ্টিকোণ থেকে যে খুব অযৌক্তিক তা আমার মনে হয়নি কখনও। লাবণ্য দাশ অতি সাধারণ বাঙালি মহিলা ছিলেন, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চেয়েছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সবার উপরে একজন স্বাভাবিক মানুষকে চেয়েছিলেন যিনি অন্য সব স্বামীর মতো নিজের জীবন স্ত্রীকে ঘিরেই গড়ে তুলবেন। অনেকটা সময় দেবেন তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্য...। লাবণ্য দাশ অভিযোগ করতেন সাংসারিক কাজকর্মে তার অবহেলা বিষয়ে। অবহেলা বা অক্ষমতা যাই বলা যাক, সংসারের সব কাজ একাই লাবণ্যকে সামলাতে হতো।'... আর কে না জানে জীবনানন্দ ছিলেন খুবই অন্তর্মুখী একজন মানুষ আর্থিক প্রাচুর্য কোনদিনই যাঁর ছিল না। সেকালের জনপ্রিয় রহস্য-উপন্যাস লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছিলেন লাবণ্য দাশের মামা। লেখক বলতে তাঁর ধারণা ছিল নীহাররঞ্জন গুপ্তের মতো লেখক। মিনু সরকারকে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন লাবণ্য, উনিও তো লেখক। কিন্তু কত টাকা উপার্জন করেন। খ্যাতিও কম নয়। কিন্তু এতই দুর্ভাগা তিনি, তাঁর কবি-লেখক স্বামী, অর্থ উপার্জন করতে তো পারেনইনি, তার জীবদ্দশায় খ্যাতির প্রশ্নও নেই।

মিনু সরকার লিখেছেন, 'লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের স্ত্রী আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে জীবনানন্দ বিষয়ে অনেক অভিযোগ শুনেছি। সেই অভিযোগ লাবণ্য দাশের দৃষ্টিকোণ থেকে যে খুব অযৌক্তিক তা আমার মনে হয়নি কখনও। লাবণ্য দাশ অতি সাধারণ বাঙালি মহিলা ছিলেন, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চেয়েছিলেন

'সমাজে তার নাম কেউ শুনেছে বলে তো মনে হতো না।' এই অনুযোগের পাশাপাশি কিন্তু লাবণ্য দাশ মিনু সরকারকে এও বলেছিলেন 'বনলতা সেন' আসলে তিনিই। জীবনানন্দ যে তাকে কত ভালোবাসতেন সে কথাও শুনিয়েছেন অনেক সময়। সব মিলিয়ে লাবণ্য দাশকে মিনু সরকারের একজন সরল সাদাসিধে পার্থিব মানুষ বলেই মনে হয়েছে।' কবিতা তিনি একেবারেই বুঝতেন না। কবিতা রচনা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটাও তার ধারণার বাইরে ছিল। 'যদিও কবির স্ত্রী বলে তাঁর একটা গর্ব ছিল।'

জীবনানন্দের কবি জীবন নিয়ে লাবণ্যের অভিযোগ অনুযোগ ছিলই। লাবণ্যর দিক থেকে উপেক্ষা ছিল না সে কথাও হয়তো বলা যাবে না। সমাজের আর পাঁচ জন গৃহিণীর মতো সুখী সংসার তিনি চেয়েছিলেন, যেখানে অভাব অনটন থাকবে না। কিন্তু বাস্তবতা হয়েছিল তার উল্টোটি। কঠিন লড়াইয়ে সবকিছুকে সামাল দিতে হয়েছে তাঁকেই। সুতরাং জীবনানন্দের মৃত্যুর পর বহু বিখ্যাত মানুষের সমাগম দেখে তরুণ ভূমেন্দ্র গুহকে অনুযোগের সুরে লাবণ্য দাশ যে বলেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কি রেখে গেলেন বলো তো।' সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। স্বামীর সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যাঁর কোন যোগ ছিল না, যাঁকে প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়েছে সংসারের অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে, তিনি যে তাঁর অসহায় মুহূর্তে এমন প্রশ্ন তুলবেন, এটা তো খুব স্বাভাবিক। ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দের মৃত্যুর সময় ভূমেন্দ্র গুহ ছিলেন ডাক্তারির ছাত্র, এবং তাঁর বয়স তখন কুড়ি-একুশ বছরের বেশি নয়। লাবণ্য দাশও সে সময় সুচরিতা দাশকে বলেছিলেন 'ভূমেন ছেলেমানুষ'। জীবনের জটিলতা বোঝার বয়স তখনও তাঁর হয়নি। লাবণ্য দাশের এই স্নায়ুবিক ভাষা 'ছেলেমানুষ' ভূমেন্দ্র বোঝেননি হয়তো। সদ্যপ্রয়াত প্রিয় কবির প্রতি তাঁর যত আবেগ ও পক্ষপাত থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। এবং জীবনানন্দের মৃত্যুশয্যার পাশে লাবণ্য দাশকে না দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি তিনি সহানুভূতিহীন হয়েছেন সেই বয়সে। অভিযোগের সুরেই ভূমেন্দ্র গুহ লিখেছেন, জীবনানন্দের অন্যান্য স্বজনরা যখন প্রায় সব সময় হাসপাতালে, 'কিন্তু তারা কেউ যা পারেননি তা হল জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশকে বেশিক্ষণের জন্য হাসপাতালে ধরে রাখতে; বস্তুত জীবনানন্দ যেদিন মারা যান, তার কয়েকদিন আগে থেকে তিনি হাসপাতালে আসা পুরো বন্ধ করে দেন এবং মৃত্যুর সময় তিনি হাসপাতালে ছিলেন না।' এ শুধু তথ্য জানানো নয়, নির্দিষ্ট দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা। পারলৌকিক অনুষ্ঠানের জন্য যেদিন ভূমেন্দ্র গুহের উপস্থিতিতে দাশ পরিবারে জীবনানন্দের ছবি খোঁজা চলছিল, এবং 'জুতসই একটি ছবি' পাওয়া যাচ্ছিল না, সুচরিতা দাশ তখন বলেছিলেন জীবনানন্দ ছবি তুলতে চাইতেন না, বলেছিলেন, 'মুখ নাকি তেমন ফটোজনিক ছিল না।' কথাটি বলেছিলেন সুচরিতা দাশ, তবু অভিযোগের মূল লক্ষ্য লাবণ্য দাশই। হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ লাবণ্য দাশের উপস্থিত থাকতে না পারার অনেক মানসিক কারণ থাকতে পারে, সেসব কারণগুলোকে কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিই না। মৃত্যুশয্যার পাশে লাবণ্য দাশের অনুপস্থিতিটাই বড় করে চিত্রিত হয়ে থাকে। শারীরিকভাবে সব সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি লাবণ্য দাশ ঠিকই, কিন্তু একধরনের মানসিক উপস্থিতি এবং সামীপ্য সবসময় ছিলই। আমাদের অনেকেই, এখনও কাছের জনের অসুস্থ শয্যার পাশে মনটাকে রেখে এসে সংসারের অন্যান্য দাবিগুলো সামলাতে বাধ্য হই না, এমন নয় নিশ্চয়। তবু স্বামীর শেষ শয্যার পাশে স্ত্রীর উপস্থিত থাকতে না পারা চিহ্নিত হয়ে থাকল দীর্ঘদিনের চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিবিড় মনোভাবে। ভূমেন্দ্র গুহ-র এই বক্তব্য নিশ্চয় পক্ষপাতমূলক। আমাদের সামাজিক পরিবেশে দুটি মানুষের দাম্পত্য জীবনে নারী ছাড়া পুরুষের সাংসারিক দক্ষতার ক্ষেত্রে আমরা নীরবই থাকি। আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নারীব্যক্তিটি সাংসারিকভাবে কতটা সফল অসফল এই আলোচনায়। পুরুষের এই ভূমিকায় থেকে যায় আমাদের একধরনের প্রশ্রয়ের উদাসীনতা। কবি জীবনানন্দের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ চিরকালই থাকবে। তার হৃদয়ের যন্ত্রণার প্রতি সহমর্মিতাও থাকবে। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না নিজেদের পরিবারে এরকম একজন তথাকথিত সাংসারিক জীবনানন্দ থাকলে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ সদস্যদের পক্ষে তাতে খুশি হওয়া সম্ভব হয়তো হতো না। পরবর্তী সময়ে পরিণত ভূমেন্দ্র গুহ লিখেছেন, 'লাবণ্য দাশ ছিলেন খুবই সুন্দরী মহিলা। নিজের রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি সবসময় সচেতন ছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ স্ত্রীকে উপেক্ষা করতেন। লাবণ্য দাশ মহিলা হিসেবে অসাধারণ ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ উৎকৃষ্ট স্বামী ছিলেন না। উৎকৃষ্ট পিতাও ছিলেন না। কাব্য নিয়েই তাঁর যত সাধনা। ধ্যান। কবিতার জন্যই, সাহিত্যের জন্যই তিনি তিক্ত জীবনযাপন করে গেছেন। তিনি তার স্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে জীবনানন্দ দাশ সংসার চালাতে যে অক্ষম, এটা (লাবণ্য দাশ) বোঝাতে ভালবাসতেন।'

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর আর সবকিছু থিতিয়ে গেলেও ভক্তমানসে গেঁথে থাকল লাবণ্য দাশের অসহিষ্ণুতা আর অসংবেদনশীলতার ছবি। গেঁথে থাকল 'মাল্যবান' উপন্যাসে জীবনানন্দ চিত্রিত অসুখী দাম্পত্যের ইশতেহার। সবাই ধরে নিল এ কাহিনি জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনেরই বিবৃতি। জীবনানন্দ যেন তাঁর আত্মজীবনকেই তুলে এনেছেন 'মাল্যবান'-উপন্যাসে। মৃত্যুর চার বছর আগে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তার অর্থকষ্টের কথা জানিয়ে জীবনানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন–... বেশি ঠেকে পড়েছি সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচশো টাকার দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন। এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি...। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়... ছদ্ম নামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন, দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি।' সন তারিখের খতিয়ান মেলালেই বোঝা যায় নিজের নামে না ছেপে ছদ্মনামে ছাপতে দিতে চাওয়া যে উপন্যাসটির কথা বলা হচ্ছে সেটি আসলে 'মাল্যবান', যেটির রচনা কাল ১৯৪৭-৪৮। সন্দেহ নেই, যে কোনো বড় লেখাই তো আসলে আত্মজৈবনিক। জীবনানন্দ-লাবণ্য হয়তো তাঁরা দাম্পত্য সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত উষ্ণতা আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু 'মাল্যবান' এর তুল্য নিষ্ঠুরতা জীবনানন্দ আর কোনো উপন্যাসে দেখিয়েছেন? এই উপন্যাসের একটা অংশে দেখা যায়–একতলার ঘরে রাত একটার পরও জেগে আছে মাল্যবান। উপরের ঘরে বউ আর মেয়েকে দেখবার সাধ হয় তার। মাল্যবান দোতলার ঘরে এসে উৎপলার যে অভ্যর্থনা পায় তার মত ভয়াবহ নিশিযাপনের দুঃস্বপ্ন ভাবতে পারবে না হয়তো কোন পুরুষ। ঘুমন্ত বউ মেয়েকে দেখে যখন মাল্যবান এর জিভে সুস্বাদ ফিরে এসেছে, রাত্রিকে তার মনে হচ্ছে স্নিগ্ধ শারীরিক; তখনই কর্কশ পলার কণ্ঠস্বর'...আ গেল যা! বসল। রাত দুপুরে ন্যাকরা করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁদিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙয়ের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে; দেখ! ওমা ওমা ওমা–বেরোও। বেরোও বলছি।' 'মাল্যবান'–এর প্রকাশক জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশ মনে করেন 'মাল্যবান' সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে আত্মজীবনীমূলক লেখা। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ক্লিন্টন বি সিলি তাঁর জীবনানন্দ জীবনীতে ('আ পোয়েট অ্যাপার্ট' প্র.প্র.১৯৯০) ভিন্নমত প্রকাশ করে লিখেছেন, 'তাঁর কোন উপন্যাসকেই আত্মজীবনী হিসেবে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, যে আত্মজীবনীটি তিনি লিখবেন বলে কিছু ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে বিষয়ে ডায়েরি লিখে রেখেছিলেন। আজ

জীবনানন্দ-লাবণ্য হয়তো তাঁরা দাম্পত্য সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত উষ্ণতা আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু 'মাল্যবান' এর তুল্য নিষ্ঠুরতা জীবনানন্দ আর কোনো উপন্যাসে দেখিয়েছেন? এই উপন্যাসের একটা অংশে দেখা যায়–একতলার ঘরে রাত একটার পরও জেগে আছে মাল্যবান। উপরের ঘরে বউ আর মেয়েকে দেখবার সাধ হয় তার

জীবনানন্দ দাশকে মধ্যমণি করে পরিবার

পর্যন্ত দাশ পরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকেই সেই ডায়েরি পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ক্লিনটন বি সিলি যখন এ মন্তব্য করছেন তখনও পর্যন্ত অবশ্য জীবনানন্দের বিপুল দিনলিপি ডায়েরির কিছুই প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে আসেনি। অশোকানন্দ দাশের মনে হয়েছিল প্রকাশের আগেই এই উপন্যাস বৌদিকে একবার পড়ানো উচিত। জানানো উচিত। লাবণ্য দাশ কি পড়েছিলেন এই উপন্যাস? হয়তো লাবণ্য দাশের ধারণাও ছিল না উপন্যাস হিসেবে 'মাল্যবান' কত বড় মাপের। তবু সে সময় ছাপার অনুমতি যে দিলেন না তার কারণ হয়তো সমকালীন সময়ের রকমারি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাঁকে বাধ্য করে এ উপন্যাসে প্রকাশ বন্ধ রাখতে। সমকালের সেই সব ব্যক্তিআলোচনা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল হয়তো। কিন্তু আমরা মনে রাখব প্রকাশের অনুমতি তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়েছিলেন এবং যে তিনটি উপন্যাস জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তার মধ্যে 'মাল্যবান'-ই প্রথম, এবং লাবণ্য দাশের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত। লাবণ্য দাশ কিন্তু তার সমস্যার কথা বুঝে 'মাল্যবান'-এর প্রকাশের অনুমতি দেননি ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট করেও দেননি। এর পাশাপাশি যদি আমরা দেখি জীবনানন্দ দাশের প্রেমিকা শোভনা বেবি বা ওয়াই (জীবনানন্দের দিনলিপিতে ইণ অথবা ণ নামে চিহ্নিত। প্রসঙ্গটি পরে বিস্তারিত আলোচনায় আসবে)–তাঁকে আবিষ্কার করেন ভূমেন্দ্র গুহ। তাঁর সঙ্গে আলাপে জানান জীবনানন্দের বেশকিছু চিঠি তাঁর কাছে আছে। পরে কিন্তু শোভনা সেসব চিঠি আর দেননি। নষ্টই করে দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত হয়তো। লাবণ্য দাশ সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় আভিজাত্যময় যে জীবন প্রতিভা বসু কিংবা রাজেশ্বরী দত্ত কিংবা প্রণতি দে-র, সেখানে যেন একেবারেই বেমানান লাবণ্য দাশ। লাবণ্য দাশ স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি অভিনেত্রী হবেন, কিন্তু স্বপ্ন তাঁর বাস্তবে রূপ পায়নি। যদিও শখের থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর সে স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোনো দোষ ছিল না। সে সময়ের উদ্বাস্তু পরিবার থেকে উঠে এসেছেন অভিনয়ের জগতের রমা সূচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অসামান্য রূপসী লাবণ্য দাশ সংসারের যুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়েছেন। নিশ্চয় কোনো অরুণকুমার সরকার তার জন্যে লেখেননি কোনো কবিতা, ও চোখের যৎসামান্য স্পর্শ পাওয়া আকাঙ্ক্ষায়। সেই আভিজাত্যময় সৌভাগ্য রচিত হতে পেরেছিল সে কেবল হয়তো প্রতিভা বসুদের জন্য। লাবণ্য দাশের বিড়ম্বিত দাম্পত্য শুধু যেন রকমারি গল্প তৈরি করেছে। বিরাম মুখোপাধ্যায় শুনেছিলেন 'লাবণ্য দাশ নাকি প্রতিদিন সিনেমা দেখে রাত্রি নটার পর বাড়ি ফিরতেন'। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, 'জীবনানন্দের পারিবারিক অনেক ঘটনাই জানি, যা খুব সুখের ছিল না। ওর বউয়ের সঙ্গে প্রতিদিন একটা দ্বন্দ্ব আমাকে বলতো। জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল'। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরও লাবণ্য দাশ সংসারে খুব যে মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন এমনটি হয়তো নয়। জীবনানন্দের চেতনার জগৎ তার সঙ্গে মেলেনি (কতজন স্ত্রীর সঙ্গেই বা মেলে!), তিনি দিন যাপন করেছেন সবার মধ্যে থেকেও হয়তো আলাদা ভুবনে। অশোক মিত্র লিখেছেন, ('শতবার্ষিকী সমারোহের পর') 'লাবণ্য দাশ কিন্তু আসতেন প্রধানত আমার কাছেই, তাঁর দুঃখের ঝুলি উজাড় করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে...। ত্রিকোণ পার্কে যে বাড়িতে আশ্রয়ে লাবণ্য দাশ তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকতেন, সেখানে, তাঁর বয়ানে, বিচিত্র ঘটনাক্রম সংঘটিত হচ্ছিল। প্রকাশকেরা সেখানে আসছেন যাচ্ছেন। প্রকাশকদের ফড়েরা আসছেন যাচ্ছেন। জীবনানন্দের অপ্রকাশিত রচনাবলি প্রকাশের মস্ত আয়োজনের কথাও শুনছেন পাশের ঘরে। লাবণ্য দাশের বিলাপ ও অনুযোগ, তার সঙ্গে কেউ একটা কথাও বলছেন না, যেন জীবনানন্দে তাঁর অধিকার নেই।' প্রকৃতপক্ষে তখন কেউই আর লাবণ্যকে বিবেচনার মধ্যে রাখেননি। যেমন জীবনানন্দের অর্থকষ্টের দিনে কেউ কার্যত তাঁর জন্য কিছুই করেননি। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর যখন একটু একটু করে জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক আসন, কবির আসন প্রতিষ্ঠিত হলো সাহিত্যের জগতে; তখন সকলেই উদাসীন লাবণ্য দাশের প্রতি। জীবনানন্দের জীবনে লাবণ্য দাশ যেন অবাঞ্ছিত কেউ। 'মাল্যবান' উপন্যাসের মাল্যবান-উৎপলা আর জীবনানন্দ-লাবণ্য যেন সমাকৃত হতে থাকল। আমরা বিস্মৃত হলাম সাহিত্য আত্মজৈবনিক হলেও জীবনের সর্বাংশ সাহিত্যের উপাদান নাও হতে পারে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর আরও কুড়ি বছর অনেক উপেক্ষা নিয়ে বেঁচেছিলেন লাবণ্য দাশ। ততদিনে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত পুত্র সমরানন্দ, কন্যা মঞ্জুশ্রী, দুজনেই।

নিজেকে নিয়ে নয়, জীবনানন্দের স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে একদা লিখেছিলেন লাবণ্য দাশ, 'মহাকালের ডাক যখন আসে, তখন ধরিত্রীমায়ের বুক খালি করে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে আমাদের পড়তেই হবে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা সবকিছুই মায়াবী মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত চিন্তা ভাবনার পরিসমাপ্তির রেখা টানতেই হয়।' ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল লাবণ্য দাশের জীবনাবসান ঘটে। •

মুহম্মদ মতিউল্লাহ্
কবি ও জীবনানন্দ গবেষক

ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় জওহরলাল নেহেরু ভবনের সামনে

বাংলাদেশি গণমাধ্যমের

ভারত দর্শন

ওবায়দুল কবির

সৌহার্দ ভ্রমণ

১৫ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার। এয়ার ভিস্তারার ফ্লাইটটি সকাল ১০টা ১০ মিনিটে নির্ধারিত সময়েই দিল্লির পথে রওনা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়া হাউসে কর্মরত আমরা মোট ২৮ জন সংবাদকর্মী, সঙ্গে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস এটাসি মি. শিলাদিত্য হালদার। ফুল ফ্লাইট যাত্রী। নতুন এয়ারলাইনস ভিস্তারার যাত্রীসেবা বেশ ভালো। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাত্রীদের জন্য যেসব সেবা দেওয়া উচিত সবই রয়েছে। কেবিন ক্রুদের আচরণও আন্তর্জাতিক মানের। জানতে পেরেছি, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইলনসের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতের টাটা গ্রুপ বিমান সংস্থাটি চালু করেছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ বৃদ্ধির প্রকল্পে সাংবাদিকদের বিশাল বহর রওনা হয়েছি দিল্লির উদ্দেশে। এক যুগ আগে একই প্রকল্পে ভারত ভ্রমণ করেছিলাম। আমার কাছে এবারের আকর্ষণ এক যুগে ভারতের আর্থ-সামাজিক পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করা। ২০১১ সালের ৪ মে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১১ জন সংবাদকর্মী গিয়েছিলাম দিল্লি। তখন ভারতে ক্ষমতাসীন ছিল সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস

হায়দারাবাদের টি-হাব ও টি-ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠানের সামনে

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সেই সময় ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রয়াত প্রণব মুখার্জিসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও ছিল দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন। দিল্লি থেকে হায়দরাবাদ দুই দিন, তারপর বারানসী। বারানসীতে আমাদের দেখানো হয়েছিল রেলের লোকমোটিভ ইঞ্জিন তৈরির কারখানা। এই কারখানা থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের বেশ কিছু ইঞ্জিন। বারাণসী থেকে কলকাতা হয়ে ঢাকা ফিরেছিলাম ১৩ মে। এবার ভারতে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। এই সফরে দুটি পৃথক রাজনৈতিক দলের সরকারের সময়ও ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। ভারতের ক্ষমতায় রাজনৈতিক দল পরিবর্তন হয়, রাষ্ট্রীয় নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এটিই সম্ভবত মূলমন্ত্র।

এগারো সালে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের একজন সদস্যের সঙ্গে। সম্ভবত তার নাম ছিল বিকে চতুরবেদি। বয়স ৬৫ কিংবা আরও বেশি। জাঁদরেল আইসিএস কর্মকর্তা ছিলেন। তিন বছর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পালনের পর অবসরে। মনমোহন সিং সরকার তাকে আবার ডেকে এনে ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা মতবিনিময়ে তিনি বাংলাদেশি সাংবাদিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, 'এই যে তোমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করছ, ভবিষ্যতে সরকার বদল হলে এসব পরিকল্পনা কি ঠিক থাকবে?' তিনি অবাক হয়েছিলেন। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেন থাকবে না? সরকার বদলের সঙ্গে পরিকল্পনার সম্পর্ক কি?' আমরা তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। কেন এমন প্রশ্ন করলাম তারও ব্যাখ্যা দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। চতুরবেদি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে গেলেন, 'সকল রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য রাষ্ট্রের উন্নয়ন। এই লক্ষ্য নিয়েই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশন। সরকার বদল হলেও পরিকল্পনা বদলের কোনো সুযোগ নেই।' আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম, এমনভাবে আমরা কেন ভাবতে পারি না।

ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ বৃদ্ধির প্রকল্পে সাংবাদিকসহ নানা পেশাজীবী দুই দেশ ভ্রমণ করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রথা চালু রয়েছে। এর মধ্যে শুধু দুই দেশের সম্পর্কে উন্নয়ন হয় না, একে অপরের সম্পর্কে জানা-বোঝারও সুযোগ পায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথাও বারবার স্মরণে আসে এ ধরনের সফর বিনিময়ে। ভূরাজনৈতিক টানাপড়েনে দুই বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ।

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বরাবরই দেশটি বাংলাদেশের পাশে থেকেছে। বিশ্ববলয়ে ভারত এখন প্রভাবশালী রাষ্ট্রের তালিকায়। এই মুহূর্তে তারা কিভাবে বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক বিষয়ে সাংবাদিকতার কারণে এই সময় ভারত সফরের আমন্ত্রণকে তাই লুফে নিয়েছিলাম।

এবার সফরের সংবাদকর্মীদের বহর ছিল বিশাল। কাগজে-কলমে আমি এবং ডিবিসি নিউজ চ্যানেলের সম্পাদক প্রণব সাহা টিম লিডার হলেও প্রেস এটাসি শিলাদিত্য হালদারই এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন বিশাল বহর নিয়ে সবার সঙ্গে সমন্বয় করে সফরটি সুন্দর করে শেষ করা যাবে কি না, এটি চিন্তার বিষয় ছিল। সদাহাস্য, ধৈর্যশীল, প্রাণবন্ত এবং মানুষকে সহজে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী এই কূটনীতিক সফরটি শেষে করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। সিনিয়র-জুনিয়র সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সাংবাদিক বহরের প্রত্যেকেই ছিলেন আন্তরিক। সিনিয়রদের সম্মান দেওয়া, জুনিয়রদের স্নেহের পরশে মাত্র ছয় দিনেই বহরটি হয়ে উঠেছিল একটি পরিবার। জুনিয়রদের অনেকের মুখেই শুনেছি সিনিয়রদের সঙ্গে এক সপ্তাহ কিভাবে কাটবে এ নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন তারা। দু'-এক দিনেই তাদের ভয় কেটে যায়। শেষ দিকে বয়সের ব্যবধান আর বোঝাই যায়নি। বিদায়ের সময় তাই অনেকের মনেই আমি বিষণ্নতা দেখেছি। সবাই বলছিলেন, ছয়টি দিন কেটে গেল খুব দ্রুত। সৌহার্দের সুন্দর পরিবেশে এমনটিই হয়। একে অপরকে মনে হয় খুব কাছের মানুষ। হয়তো এই সম্পর্ক অনেকেই বয়ে নিয়ে যাবেন অনেক দূর। এই সম্পর্ক হয়তো তৈরি করবে আরও সম্পর্কের সেতু বন্ধন।

কথা ছিল আমরা রওনা হব ১৪ সেপ্টেম্বর। প্রশাসনিক জটিলতায় এটি পিছিয়ে হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর। সকালে রওনা হয়ে আমরা পৌঁছেছি দুপুরের দিকে। এই দিন কোনো কর্মসূচি ছিল না। পরদিন সকালে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিকালে শিলাদিত্যের নেতৃত্বে একদল চলে গেলেন সরোজিনি মার্কেটে। কয়েকজন গেলেন ভারতীয় ব্র্যান্ড শ্রী-লেদারের জুতা কিনতে। টিমের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য মাছরাঙা টিভির প্রধান সম্পাদক রেজোয়ানুল হক রাজা ঢাকা থেকেই চলমান বিশ্বকাপের একটি খেলা দেখার আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। এই দিন দিল্লিতে ইংল্যান্ড-আফগানিস্তানের খেলা ছিল। শিলাদিত্য অনেক চেষ্টা করে তিনটি টিকিট জোগাড় করতে পেরেছিলেন। রাজা ভাই দুজন জুনিয়র ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন খেলা দেখতে। রাতে হোটেলে বসেছিল বয়সভিত্তিক গ্রুপ আড্ডা।

সফরের প্রথম দিন ছিল খুবই কর্মব্যস্ততা

১৬ অক্টোবর ছিল আমাদের খুবই কর্মব্যস্ততা। সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জওহর লাল নেহরু সম্মেলন কক্ষে সফরের প্রথম কার্যসূচি। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ডেস্কের পরিচালক স্মীতা পান্থ, উপসচিব নবনিতা চক্রবর্তী। অরিন্দম বাগচী এবং নবনিতা চক্রবর্তী পশ্চিম বাংলার বাঙালি। নবনিতা ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে কাজ করে গেছেন কয়েক বছর। কয়েক সাংবাদিক তাঁর পূর্ব পরিচিত। দুজন বাঙালির কারণে আলোচনায় মাঝেমধ্যেই চলে আসে বাংলায় কথা বলা। আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সুযোগ না থাকলেও এতজন বাঙালি কাছে পেয়ে ভারতীয় দুই বাঙালি কর্মকর্তা বাংলায় আলোচনা বেশ উপভোগ করছিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার আলোচনায় দুই দেশের নানা সম্পর্কের বিষয় উঠে আসে। অনেকটাই স্পষ্ট হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব। আলোচনায় বাদ যায়নি ভারতীয় ভিসা জটিলতার কথাও।

সাংবাদিকদের অনেকেই বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা জটিলতার কথা উল্লেখ করে বলেন, যেখানে আমরা মুদ্রা বিনিময় চুক্তি করেছি, ভবিষ্যতে সম্পর্কের আরও দিক সম্প্রসারিত হবে, প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ভিসা পদ্ধতি উঠিয়ে দিয়েছে তখন ভারতের সঙ্গে আমাদের ভিসা চালু রাখার প্রয়োজন কি? জানানো হয়, সাম্প্রতিক ভিসা সমস্যা সাময়িক। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় কর্মকর্তাগণ দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে ভারতের সহায়তা, ধীরে ধীরে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ইত্যাদি।

ওখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় টিভি চ্যানেল দূরদর্শন

স্টুডিও পরিদর্শনে। শুরুতে দূরদর্শন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, বর্তমানে হিন্দি ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ নিউজ চ্যানেল পরিচালনা করছেন তারা। ইংরেজি ভাষায় ২৪ ঘণ্টা আন্তর্জাতিক চ্যানেল শুরু হয়েছে গত দুই বছর আগে। এ ছাড়া ২৮টি আঞ্চলিক ভাষায় দূরদর্শন টিভি চ্যানেল দেখা যায় সারা ভারতে। বিকেলে সাংবাদিকরা পরিদর্শন করেন ভারতীয় কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ কার্যালয়। ব্রিফিং সেশনে প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা ভারতের শিল্প খাতের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে অনেক প্রকল্পে ভারতীয় বিনিয়োগ রয়েছে। গত কয়েক বছর বাংলাদেশ থেকে ভারতে আমদানি বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ঘাটতি ধীরে ধীরে কমে আসছে।

বিকেলে সাংবাদিকরা মতবিনিময় করেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে। নির্বাচন কমিশন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজিভ কুমার ভারতের নির্বাচন কিভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তার বিস্তারিত তুলে ধরেন। বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে ভারতের নির্বাচন একটি মডেল। বিগত ৬০ বছরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কমিশন নিয়ে বড় ধরনের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচন নিয়ে কারও কারও প্রশ্ন থাকতেই পারে। এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া যায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে। কোনো প্রার্থী তাদের অসন্তুষ্টি নিয়ে আদালতেও যেতে পারেন। কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে আদালতে তাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরে অভিযোগকারী ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া। তিনি দাবি করেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন সকলের কাছে আস্থাশীল। এটি একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের প্রমাণ করতে হয়েছে। এখন মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনের সময় কমিশনের কাজের প্রক্রিয়া তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। আমাদের মনে হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচনি আইন এবং কর্মপদ্ধতি ভারতের মতোই। তারা শুধু বিশ্বাস অর্জন করে একের পর এক প্রশ্নাতীত নির্বাচন উপহার দিতে পারছেন। প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হওয়ার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন। এর মধ্যে ভোটার উপস্থিতির পরিমাণ কিংবা সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে এমন কোনো বিষয় নেই। কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করতে পারলেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে। দীর্ঘ আলোচনায় মি. রাজিভ কুমারকে খুব একটা বিচলিত মনে হয়নি। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন খোলামেলা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী আলোচনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সহায়তা করেন।

পরে সাংবাদিকদের ইভিএম পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়। ইভিএম একটি মেশিন। এর সঙ্গে কোনো ডিভাইসের সংযোগ থাকার সুযোগ নেই। এমনকি যন্ত্রটি চালাতে বিদ্যুৎ সংযোগের পরিবর্তে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনোভাবেই বাইরে থেকে যন্ত্রটির ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব না হয়।

রাতে সাংবাদিকদের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নৈশভোজের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, ভারতের সিনিয়র সংবাদকর্মী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মূলত অনানুষ্ঠানিক আলোচনার সুযোগ ছিল এই নৈশভোজে। এসব আলোচনায় বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন। একইভাবে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশিদের মনোভাবও বোঝার চেষ্টা করেন ভারতীয় কর্মকর্তাগণ।

দ্বিতীয় দিনের প্রধান আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহশালা

সফরের দ্বিতীয় দিন সাংবাদিকদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় দিল্লি ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহশালা। দিল্লি মিউজিয়ামে খুঁজে পাওয়া যায় আদিকাল থেকে উপমহাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। ন্যাশনাল মিউজিয়ামে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সকল সময়ের অসংখ্য সংগ্রহ দর্শকদের দৃষ্টি কাড়বে। মহেঞ্জোদারো ছিল

গ্রুপ ছবিটি আআইটি হায়দরাবাদের ভেতরে

খ্রিষ্টপূর্ব ২৬ শতাব্দীতে নির্মিত প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বৃহত্তম শহরের একটি। ওখানে গড়ে উঠেছিল আরও কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক শহর হরপ্পা, লোথাল, করিবাঙ্গান, ধরাবিরা, রাখিগাড়ি ইত্যাদি। এর মধ্যে মহেঞ্জোদারো ছিল পুরকৌশল এবং নগর পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠ। খ্রিষ্টপূর্ব ১৯ শতাব্দীতে আকস্মিকভাবে পতন ঘটেছিল সিন্ধু সভ্যতার। তখনই মহেঞ্জোদারো পরিত্যক্ত হয়। মহেঞ্জোদারুর অনেক সংগ্রহ পাওয়া যাবে দিল্লি মিউজিয়ামে। আমাদের হাতে সময় ছিল খুবই কম। তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করতে হয়েছে। সারা দিন সময় নিয়ে কেউ দেখতে চাইলে খুঁজে পাবেন এই উপমহাদেশের সভ্যতার ইতিহাস।

দিল্লি মিউজিয়াম থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে গুড়গ্রামে। সবুজ বৃক্ষে ঘেরা শ্যামলিমায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি জোটের কার্যালয়। সারা বিশ্বে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ১১৬টি। বাংলাদেশ এই জোটের সদস্য হয়েছে ২০১৬ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশ এই জোটের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছে। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুতের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। জায়গা স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি জোটের কর্মকর্তাগণ। তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ হওয়া উচিত বিশ্বের প্রথম পছন্দ। কর্মকর্তারা আশা করেন খুব শীঘ্রই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির খরচ কমে আসবে। তখন ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে গৃহস্থালি কাজ করা সম্ভব হবে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের চিফ অব অপারেশন মি. জসুয়া ওয়েকলিফ এবং প্রকল্প প্রধান রমেশ কুমার।

এই দিন আমাদের তৃতীয় পরিদর্শন ছিল প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালাটির থিম আমাদের দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম শপথ অনুষ্ঠানের দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হয়েছিল বিশ্বের প্রায় সব টিভি চ্যানেলে। শপথ গ্রহণ শেষে নরেন্দ্র মোদি তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস নেতা এবং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে প্রণাম করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রণব মুখার্জি তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সৌন্দর্য বোধ হয় এখানেই। প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহশালায় গিয়ে আমার আবারও এ কথা মনে হয়েছে।

ভারতের সংবিধান রচনা থেকে শুরু প্রথমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এই সংগ্রহশালায়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর বাসভবনটি তার মৃত্যুর পর জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। নেহরুর বাড়ির পেছনে বর্তমান সরকার নির্মাণ করেছেন আধুনিক সংগ্রহশালা। নেহরু থেকে শুরু করে মনমোহন সিং পর্যন্ত ভারতের সব প্রধানমন্ত্রীর কিছু না কিছু স্মৃতি, বিদেশ থেকে পাওয়া উপহার এবং ইতিহাস ওখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে যত্নের সঙ্গে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকা এবং নানা কর্মকাণ্ডের দশ মিনিটের একটি ডকুমেন্টরিও দেখানো হচ্ছে দর্শকদের। নরেন্দ্র মোদি

গোলকুন্ডা ফোর্ট ভ্রমণ

যেহেতু এখনো প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন তার কোনো জিনিসপত্র ওখানে ঠাঁই হয়নি। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না তখন এগুলো সংগ্রহশালায় স্থান পাবে। নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই আধুনিক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। '২২ সালে উদ্বোধন হয়েছে এই সংগ্রহশালাটি। অথচ এটিকে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। বিকেলে কুতুব মিনার দেখার কর্মসূচি থাকলেও সাংবাদিকদের অনাগ্রহে এটি বাতিল করা হয়। এই সময়টা অনেকে কাটিয়ে দেন শপিং বা ঘোরাঘুরি করে। কেউ কেউ ঘুরে আসেন লাল কেল্লা। আমি বসেছিলাম হোটেল কক্ষে রিপোর্ট লেখার কাজে।

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের শেষ কার্যসূচি ছিল ১৭ অক্টোবর রাতে দিল্লির প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায়। ভারতে কর্মরত বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ নৈশভোজের আয়োজন করেন। দিল্লি প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি গৌতম লাহিড়ী পশ্চিমবাংলার মানুষ। বাঙালি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ নিয়ে তার এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব থাকে সব সময়। তিনিই প্রেস ক্লাবে ডিনার আয়োজনের সকল ব্যবস্থা করে দেন। বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা ছাড়াও দিল্লির বেশ কয়েক সাংবাদিক ডিনারে আমন্ত্রিত ছিলেন। কূটনীতিক-সাংবাদিকদের মিলনমেলার আলোচনায় দুই দেশের সম্পর্কের নানা দিক উঠে আসে।

সফরের তৃতীয় দিন হায়দরাবাদ

১৮ অক্টোবর বুধবার আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে হায়দরাবাদের উদ্দেশে দিল্লি ত্যাগ করি। দুই ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের এই ফ্লাইট। সরকারি প্রতিষ্ঠান এয়ার ইন্ডিয়ার সেবার মানে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জানতে পেরেছি, সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে ভারতের বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টাটা। ২০১১ সালে ভারত সরকারের এই সম্পর্ক উন্নয়নের কর্মসূচিতেও আমাদের দিল্লি থেকে যেতে হয়েছিল হায়দরাবাদ। এক যুগ আগে সেই সফরে আমাদের রাখা হয়েছিল আইসিটি কাকাতিয়া হোটেলে। তখন বসন্তের শেষ বেলা। গাছ-পানি ঘেরা হোটেলের পরিবেশও ছিল চমৎকার। সকালে ঘুম ভাঙত কোকিলের ডাকে। অলস সন্ধ্যায় হোটেলের লবিতে হাঁটাহাঁটি করলেও পাওয়া যেত কোকিলের ডাক। মনে হতো, বাংলাদেশের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে যেন কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের রাখা হয়েছে শহরের একটু বাইরে হায়দরাবাদ শেরাটনে। হোটেলে আভিজাত্যের কোনো কমতি ছিল না। ভোরে জানালার পর্দা সরালে কচি রোদ আছড়ে পড়ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। সামনের দিকে তাকালে দেখা যেত শহরমুখী ছয় লেনের আধুনিক পিচঢালা সড়ক।

হায়দরাবাদ আধুনিক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানান রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক এন ভেঙ্কাটেশ ওয়ারা রাও। তিনি সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সবাইকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন। ওখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলে। দুপুরের খাবার সেরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোহিনূর হীরাখ্যাত গোলকুন্ডা দুর্গে। এই দুর্গের প্রথমে নাম ছিল মাটফোর্ট। স্থানীয় ভাষায় বলা হতো গোল্লাকুণ্ড। গোল্লা মানে গোলাকার ও কুণ্ড মানে পাহাড়। বাহমানি সুলতান কুতুব শাহ এই দুর্গ নির্মাণ শুরু করেছিলেন। দুর্গটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ৬২ বছর। সুলতান অবশ্য জীবদ্দশায় দুর্গটি দেখে যেতে পারেননি। দুর্গের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এগিয়ে চলতে চলতে গাইড 'শেখ বাবা' বলতে থাকেন গোলকুন্ডা দুর্গের ইতিহাস। গাইড শেখ বাবার গল্পের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোহিনূর হীরা। গোলকুন্ডার অদূরে বিজয় বরাকুত্তর গ্রামের এক বয়স্ক নারী পেয়েছিলেন এই হীরা। তিনি হীরাটি উপহার দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজাকে। কোহিনূর হীরাটি পরে কোনো এক রাজার আক্রমণের সময় লুট হয়ে যায়। যে জায়গাটিতে হীরাটি রাখা হয়েছিল তা এখন গোলকুন্ডার নাগিনা গার্ডেন। গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সবাই কখন যে উঠে যাই ৪৮০ ফুট উঁচুতে দুর্গের চূড়ায়। হাজার হাজার বছর আগের স্থাপত্য শিল্প ছাড়াও এই দুর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় গোটা হায়দরাবাদ শহর। গোলকুন্ডা দুর্গের সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল গাইড শেখ বাবা। তিনি বাঙালি অথচ এতগুলো বাঙালি সাংবাদিক কাছে পেয়েও তিনি একটি বাংলা কথা বলেননি। স্বভাবসুলভ হিন্দি ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন দুর্গের অজানা তথ্য। কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি তার বাঙালিত্বের ঘোষণা দেন।

দুর্গের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করে আমরা চলে যাই হায়দরাবাদ কারুশিল্প গ্রাম শিল্পারামাম্। তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কারুশিল্প গ্রামে সারা বছর প্রদর্শিত হয় ভারতীয় শিল্প, কারুশিল্প ও গ্রামীণ জীবনের আবেশ। গ্রামীণ জাদুঘর মানুষকে নিয়ে যায় অতীতের কাছে। ৬৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কারুশিল্প গ্রামে প্রদর্শিত হয় হাতে তৈরি জামা-কাপড়, শাড়ি, শো-পিসসহ আকর্ষণীয় নানা তৈজসপত্র। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এই গ্রামে আসেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনে মেলার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে নৃত্য, সংগীত ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কেনাকাটা ছাড়াও পর্যটকরা উপভোগ করেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চতুর্থ দিনের কর্মব্যস্ত সময়

হায়দরাবাদ সফরের দ্বিতীয় দিনের প্রথম কার্যসূচি ছিল ভারত বায়োটেক পরিদর্শন। ওখানে সাংবাদিকদের ব্রিফিং এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত এইচআইভিসহ ১৯টি টিকা আবিষ্কার করেছে। এর মধ্যে চারটি টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেয়েছে। এর আগেও করোনার টিকা কো-ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়েছিল ভারত। মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, ভারত বায়োটেক অসংক্রামক রোগ ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসের টিকা আবিষ্কারেও অনেক দূর এগিয়েছে। ট্রায়াল চলছে টিভি ভ্যাকসিনের। খুব শীঘ্রই হয়তো মানব জাতি এই ভয়ংকর দুটি রোগ থেকে মুক্তি পাবে। জিকা ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া নিয়েও গবেষণা শেষ পর্যায়ে। শিশুদের ডায়রিয়া রোধে রোটা ভাইরাসের টিকার ডোজ কমিয়ে এনেছেন তারা। এই গবেষণায় তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আইসিডিডিআরবিতে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ডা. ফেরদৌসী কাদরি। প্রশ্নের জবাবে বায়োটেক মুখপাত্র জানান, ডেঙ্গু ভ্যাকসিন নিয়েও তারা কাজ শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি না হলেও তিনি আশাবাদী, একদিন ভ্যাকসিনের মাধ্যমেই এই অভিশপ্ত মহামারি থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। তিনি আরও জানান, কোভিড-১৯ এখন আর মহামারি না থাকলেও এর কিছু বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া মানবসমাজে রয়ে গেছে। যারা মারাত্মক অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত রয়েছেন তাদের জন্য কোভিড এখনো বিপদের কারণ। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি তাদের আবিষ্কৃত কো-ভ্যাক্স নিয়ে আরও গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এখন আর ভ্যাকসিনটি ইঞ্জেকশন আকারে দিতে হবে না। নাকের মধ্যে একটি ড্রপ দিলেই চলবে। এতে ভ্যাকসিনের সাইড অ্যাফেক্ট কমে যাবে। তিনি দাবি করেন, বিশ্বে এ পর্যন্ত যেসব কোভিড ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এর মধ্যে কো-ভ্যাক্স সবচেয়ে নিরাপদ। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র ১৫ শতাংশ, যেখানে অক্সফোর্ড ও মডার্নার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ৭০ শতাংশ। মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, লাম্পি রোগে ভারতে প্রচুর গরুর মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি কাজ। বাংলাদেশেও

এই রোগে অনেক গরু মারা গেছে। দুটি টিকা নিয়েও তাদের গবেষণা শেষ পর্যায়ে। টিকা দুটি আবিষ্কৃত হলে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশও উপকৃত হবে।

১৯৯৬ সালে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের জেনম ভ্যালিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত বায়োটেক। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. কৃষ্ণা এম এলা জন্মগতভাবে ভারতের নাগরিক হলেও লেখাপড়া ও গবেষণা কাজের সূত্রে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী সুচিত্রা এলার অনুপ্রেরণায় ভারতের নাগরিকত্ব ফেরত নেন এবং ভারতে বায়োটেক প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত বায়োটেকেই সাংবাদিকদের জন্য আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্যসম্মত দুপুরের খাবার।

বিকেলে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় টি-হাব পরিদর্শন। প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনার নানা ধারণা নিয়ে কাজ করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত পণ্য সঠিক পদ্ধতিতে উৎপাদন এবং বাজারজাত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়। বিশাল ভবনে একদল গবেষণাকর্মী রাত-দিন কাজ করে চলেছেন। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং বৃদ্ধি করা যায় সে ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয় এই প্রতিষ্ঠানে। টি-হাব পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয় টি-ওয়ার্ক নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের পণ্য তৈরিতে সহায়তা করছে। বলা যায় টি-হাবের ধারণাগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে টি-ওয়ার্ক নামের প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাংবাদিকদের জানান, এই প্রতিষ্ঠানে খুব ছোট যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে হাই টেকনোলজির পণ্যও তৈরি করা হয়। মহাকাশে নিক্ষেপিত ভারতের দ্বিতীয় রকেটের অনেক কাজ হয়েছে টি-ওয়ার্কে। তিনি সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখান। টি-ওয়ার্ক পরিদর্শন শেষে হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে যায়।

পঞ্চম দিনের শেষ কার্যসূচি

হায়দরাবাদে আমাদের শেষদিনের প্রথম কার্যসূচি ছিল তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (আআইটি) পরিদর্শন। সারা ভারতে এ ধরনের মোট ২৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে লাখ লাখ ভারতীয় ও বিদেশি শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছেন। হায়দরাবাদ আইআইটি শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৬শ' একর জায়গায় গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে প্রকৌশল, প্রযুক্তি ছাড়াও ফ্যাকাল্টি রয়েছে প্রায় তিনশ'। প্রতিষ্ঠানের গেটে আমাদের স্বাগত জানান মিতালী আগরওয়াল। স্মার্ট, আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষিত এই মহিলা প্রতিষ্ঠানের পাবলিক রিলেশন বিভাগের কর্তা। আমাদের বহনকারী বাসে চড়েই তিনি ঘুরে দেখান গোটা ক্যাম্পাস। আধুনিক স্থাপত্যকলায় নির্মিত ১৭টি ভবনে চলছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম। তিনি জানান, বিশেষ স্থাপত্যকলায় নির্মিত শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যাতে গ্রীষ্মের ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ক্যাম্পাস পরিদর্শন শেষে আমাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক বিএস মূর্তি। তিনি জানান, বর্তমানে গ্রেডিং অনুযায়ী হায়দরাবাদ আইআইটি ভারতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক গ্রেডিংয়েও তাদের স্থান অনেক ওপরে। বর্তমানে পড়াশোনা করছেন ৪ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থী। আগামী পাঁচ বছরে তারা বিশ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে চান। এভাবেই প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের তারা বিশেষ সুবিধাসহ লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে চান। সিজিপিএ ১০-এর মধ্যে ন্যূনতম ৮ থাকলেই শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতেও আগ্রহী। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আগ্রহী হলে তারা সার্বিক সহযোগিতা করবেন। ওখানে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে শিক্ষার্থীরা বছরে ৬০ হাজার রুপি এবং পিএইচডিতে এক লাখ রুপি পর্যন্ত স্কলারশিপের সুযোগ পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর পর প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানে দুজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। একজন হচ্ছেন চাঁদপুরের আবুল হাসানাত। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) থেকে বিএসসি সম্পন্ন করে স্কলারশিপ নিয়ে

হায়দারাবাদ বিমান বন্দরে বাংলাদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা

ওখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে লেখাপড়া করছেন। আরেক শিক্ষার্থী ঢাকার উৎপল কুমার ঘোষ স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি করছেন।

হায়দরাবাদে আমাদের শেষ কার্যসূচি ছিল রামুজি ফিল্ম সিটি পরিদর্শন। আইআইটি থেকে মুম্বাইগামী হাইওয়ে ধরে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে রামুজি। হায়দরাবাদ থেকে মুম্বাই যাওয়ার হাইওয়ে এটি। ১২ বছর আগে যখন এই মহাসড়ক ধরে রামোজি ফিল্ম সিটিতে গিয়েছিলাম তখন এটি তৈরি করা হয়েছে মাত্র। তখনো রাস্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সার্ভিস রোড নির্মাণ এবং টোল প্লাজা বানানোর কাজ চলছিল। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন ছিল না। ধু-ধু মাঠ ও পাহাড় কেটে হাইওয়ে করা হয়েছে। পাথরের পাহাড়। রাস্তা তৈরির পাথর বাইরে থেকে আনতে হয়নি। কিছু দূর পরপরই পাথর ভাঙার কারখানা। এখন ছয় লেনের পূর্ণাঙ্গ হাইওয়ে। মাঝখানে দশ ফুটের মতো আইল্যান্ডে করা হয়েছে নানা রঙের ফুলের বাগান। হাইওয়ের পাশেই দুই লেনের সার্ভিস রোড। হায়দরাবাদ থেকে হাইওয়ে ধরে মুম্বাই যাওয়া যায়। দূরত্ব ৭শ' কিলোমিটার। সময় লাগে ৬-৭ ঘণ্টা। হায়দরাবাদ থেকে হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে ব্যাঙ্গালুরু কিংবা চেন্নাইও যাওয়া যায়। দূরত্ব ৭শ' কিলোমিটার। অর্থাৎ মুম্বাই, ব্যাঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের ঠিক মাঝখানে হায়দরাবাদ।

হাইওয়ে ধরে প্রায় দেড় ঘণ্টা চলার পর পৌঁছে গেলাম রামোজি ফিল্ম সিটির গেটে। অফিসের ওয়েটিং রুমে হাতমুখ ধুয়ে রওনা হলাম ফিল্ম সিটি দেখতে। সবার বুকে সেঁটে দেওয়া হলো একটি করে স্টিকার। এবার আর আমাদের পরিবহন নয়, ফিল্ম সিটির নিজস্ব বাসে ওঠানো হয়। পাথর কেটে, নিচু ভূমিকে জলাধার বানিয়ে ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে গোটা এলাকা। অপূর্ব সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন লোকেশন। আমাদের গাইড একটি বাঙালি মেয়ে। আমরা বাঙালি জেনে খুব খুশি হলেন। সেদিন ছিল দুর্গাপূজার ষষ্ঠী। ছুটি পেলে কলকাতায় গিয়ে পূজা করতেন। ছুটি না পেয়ে কাজ করছেন ফিল্ম সেন্টারে। আমাদের পূজার শুভেচ্ছা জানালেন। গোলকুন্ডা দুর্গের শেখ বাবার মতো নন, মনে হলো বেশ কিছুদিন পর বাংলায় কথা বলতে পেরে খুবই আনন্দ পাচ্ছেন মেয়েটি। বারো বছর আগে যা ছিল এখনো তা-ই রয়েছে এই ফিল্ম সিটিতে। আমাদের দেখানো হয়, কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কঠিন কঠিন দৃশ্য ধারণ করা হয়। এবার যুক্ত হয়েছে ভারতের সর্বকালের অন্যতম ব্যবসাসফল ছবি বাহুবলির সেট। ছবি মুক্তি পেয়েছে কয়েক বছর আগে। সেটটি ভাঙা হয়নি, রেখে দেওয়া হয়েছে পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য। রামোজি ফিল্ম সিটি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ চলচ্চিত্র নির্মাণকারী স্টুডিও। চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি ফিল্ম সিটি থেকে কর্তৃপক্ষের বড় আয় হয় পর্যটন থেকে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর পর্যটক আসেন এই ফিল্ম সিটি পরিদর্শনে। আবার মুম্বাই হাইওয়ে ধরে প্রায় এক ঘণ্টা ড্রাইভ করে ফিরলাম হোটেলে। পরদিন ২১ অক্টোবর সকালে ইন্ডিগো এয়ারের ফ্লাইটে হায়দরাবাদ থেকে ঢাকায় এবং বিকেলে যোগদান করি নিজ নিজ কর্মস্থলে। •

ওবায়দুল কবির
নির্বাহী সম্পাদক, জনকণ্ঠ

রণজিৎ দাশ

হে নিস্তব্ধ শালবন

হে নিস্তব্ধ শালবন,
ক্ষুদ্র জন্তুদের পথে আমাকে ভিতরে নাও
ঝরা পাতা যেন চুপ থাকে
আমাকে স্পর্শ দাও অজস্র নীরব কাণ্ডে, বল্কলে, অংকুরে
আমার প্রদাহ মোছো শীতল ছায়ায়
অল্প কিছু খেতে দাও শালের পাতায়–
পিঁপড়ের ডিম, কচু, একমুঠো ভাত
সুবাতাসে কুবাতাসে জঙ্গলের বেদনার কথা
সাঁওতাল-মায়ের মতো বলো কানে কানে
দু-দণ্ড আশ্রয় দাও তোমার সন্তানে

যতই শহরে থাকি, বহুতলে,
জীবনের অতল বিপাকে–
হে নিস্তব্ধ শালবন,
তুমি শুধু সারাক্ষণ
রক্ষা কোরো আমার আত্মাকে

সন্তোষ ঢালী

চামড়া খুলে রেখেছি

পুরনো শার্ট ভেবে আমি আমার চামড়া খুলে রেখেছি যত্ন করে
কোনো বোতাম ছিল কিনা জানি না, খুঁজে পাইনি
অথচ বোতামেরও প্রয়োজন ছিল জামাটা গায়ে আঁটার জন্য,
এত কিছু ভেবে দেখিনি কখনো রাতের তারা গুনে গুনে;
পুরনো শার্ট ভেবে আমি আমার চামড়া খুলে রেখেছি আলনায়–

চামড়ার সাথে লেগে থাকে অনুভূতি, ব্যথা
এখন পিঠে কেউ মারলেও লাগবে না, ব্যথা খুলে রেখেছি আলনায়
সাপ যেমন খোলস খুলে রাখে তারপর ঢুকে পড়ে গর্তে,
আমার অবশ্য তেমন কোনো গর্ত নেই কিংবা চন্দনবৃক্ষ
একটা আকাশ ছিল যা এখন মেটে রঙের ষাঁড় দিনরাত গোঁঙায়;

সময় হলে সাপ আবার ফণা তোলে নতুন খোলস গায়ে
সময় নিজেও এক ভয়ংকর সরীসৃপ ফণায় ছোবল রাখে–

টোকন ঠাকুর

শূন্যতাসমগ্র

নীল আকাশের দার্শনিক নাম শূন্যতা
এবং এই মুহূর্তে আমার মেইলিং অ্যাড্রেস থেকে পুলিশ, প্রেস ও কাস্টমসের চোখ এড়িয়ে
উড়ে যাচ্ছে স্মৃতিগ্রস্ত গুচ্ছগুচ্ছ রঙিন বেলুন
হয়তো, বেলুনের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে মানব-সম্পর্কের গুঁড়িগুঁড়ি ইতিহাস
শূন্যতা ঘরভর্তি। বারান্দায়। সিঁড়িতে। উঠোনে
আমার বালিশভর্তি শূন্যতা।
আমি যা আঁকড়ে ধরি, শূন্যতা
অভিধানের মধ্যে এখন একটাই শব্দ, শূন্যতা
কবিতা লিখছি, কবিতার মধ্যে শূন্যতারা তোপধ্বনি করে যাচ্ছে, যা খুবই বিপজ্জনক
শূন্যতারা আমাকে মাও সেতুঙ মনে করে কমরেড–স্যালুট দিচ্ছে
আবারও বলছি, নীল আকাশের দার্শনিক নাম শূন্যতা
এবং এই মুহূর্তে আমি আকাশের মধ্যে শুয়ে আছি :
কেননা, উৎপাদিত শূন্যতার কারণ, তার কারণ, কারণেরও কারণ খুঁজতে খুঁজতে
চৌদিকে তাকিয়ে দেখি, আমার মেইলিং অ্যাড্রেস থেকে
আন্তরিকতাপূর্ণ অনেক বিগত কথার হাওয়ায় ফোলানো স্মৃতিগ্রস্ত রঙিন বেলুন উড়ে যাচ্ছে

ফরিদ কবির

গন্তব্য

রাস্তা আসে
চক্রাকারে ঘোরে বাড়ির চারপাশে
নিচুস্বরে ডেকে যায়...

দরোজা খুললেই দেখি–
শরীর বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে
আদিগন্ত বহু রাস্তা
বাড়ির অপর পাশ থেকেও শুনতে পাই
রাস্তার গোঙানি
পাই বা না পাই
রাস্তা আমাকেও ঘিরে থাকে সারাক্ষণ

প্রতিদিন আমিও পা ফেলি
মিশে যাই অজস্র রাস্তায়
পথের সাধ্য কি
কাউকে গন্তব্যে নিয়ে যায়!

রাস্তায় রাস্তায় মিশে নিজেকেও রাস্তা মনে হয়...

আমি আর রাস্তা দুজনে মিলেই
খুঁজে ফিরি গন্তব্যকে
সেও হয়তো-বা খোঁজে আমাদেরকেই...

শঙ্খশুভ্র পাত্র

এমন অলসমুদ্রা

শুঁয়োপোকা, সে অসূয়া নয়–তবে সজনী
প্রকৃত অর্থে সজনেগাছ বই কমলকোরক।

সূর্য

ভিতরে ভুল বানানেই বীর–ধন্দ!
হাস্যরসে
এ কোন, কৌণিক–সমতল?

অতলে হারাবে ওই সৌখিনতা
মর্ম, প্রিয় উপাখ্যান
পছন্দের শব্দ অনুগত

এই যে ঝিকিমিকি শিখিপাখা সিকিঅন্ত প্রাণ
মেঘে কি করুণা, কেকা, কদম্ব, দম্ভেরও শেষ
আরম্ভেই কুম্ভকর্ণ?

এমন অলসমুদ্রা : কলসে কামনাজল ছলোছলো
কাঙ্ক্ষিত কাঁখে, শাঁখে, শাখায়-শাখায় প্রবাহিত...

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

অনিদ্রা

একদিন দুপুরবেলা তোমার বাড়ি যাব।
দীর্ঘ আলোচনা করব আমরা।
চন্দ্রায়নের কথা উঠতে পারে।
না-ও উঠতে পারে!
ইজরায়েলের যুদ্ধ, গাজা, মৃত বাচ্চাদের কথা উঠতে পারে,
না-ও উঠতে পারে!
রাত গিলে খেতে আসছে, এমন খ্যাপাটে কথাবার্তা হতে পারে,
না-ও হতে পারে!
ইদানীং তুমি কী কী মেডিসিন নিচ্ছ,
সেসব কথা আসতে পারে,
না-ও আসতে পারে।
এবার তোমার বাড়ি যাব দুপুরে। চুপচাপ।
বেড়ালডিঙোনো ভাত খাব।
আর সাদা মদ।
তুমি গান করবে। আমি কবিতা পড়ব।
পাঁচটা, ছটা।
তারপর লম্বা আলোচনা হবে আমাদের।
ভাবি, হাই উঠবে।

জাহানারা পারভীন

নিমগাছের পরিচয়পত্র

নিমগাছটাকে চিনতেই পারিনি
ভেবেছি সে ছাতিম, সেগুনের সন্তান

সে বলেছে সব হাতেই থাকে কিছু তিতেরেখা
সরু পথ ধরে কিছুটা হেঁটে আসা যায়
আবার ফিরে আসতে হয় পুরোনো পৃষ্ঠায়
যেমন ফিরে আসে
হুইল থেকে সুতো নিয়ে ছুটে যাওয়া মাছ
শিকারির হাতের নাগালে

পড়ি বিদ্রুপ, বিদ্রোহ,
মুখোশের আড়ালে থাকা মুখ
শিংমাছের ঘাই খেয়ে হেসে ওঠা মানুষ
দেয়ালে টানিয়ে রেখেছি জেদ; ফ্রেমে নিম কাঠ,
যার নাম ধরে ডেকে উঠেছিলাম একদিন...

বিশ্বজিৎ

সময়

দায় ও দায়িত্ব মেপে
লড়াই লিখে যাচ্ছ।
চেনা গন্ধে–
সমুদ্রপারাপার...

ঘোড়ার খবর কেউ রাখে না।
ছোট ছোট ইনিংস সাঁতরে,

অপ্রকাশিত–
নিলামের অন্ধকার...

শেলী সেনগুপ্তা

স্বয়ংবরা

হাতের মুঠোয় আর ধরে রাখবো না শীতার্ত ভোর
কুয়াশায় মুখ লুকিয়ে গাইবো না বেদনার সারিগান,

নিহত আত্মা পুড়িয়ে
সেদ্ধ খেজুর রসে আসবে পুরাবৃত্তির আহ্বান
সুখগুলো স্থান নেবে
সিংহের মুখকাঙ্কিত আসনে

সুখ নিংড়ানো ভালো থাকা যদি বিপ্লব হয়
আমি স্বয়ংবরা হবো

মারুফ রায়হান

রুমাদির সঙ্গে কলকাতায়

রুমাদি ঢাকায় এলেন আর আমার পা ভাঙল
ভাঙা মন জোড়া লাগল বটে পরোক্ষ কৌতুকরসে
তবে ক্রাচে ভর দিয়ে কি আর তেপ্পান্ন গলি চষে ফেরা যায়
তাই ছাদবারান্দায় গানের জলসা গড়ে দিলেন ঠাকুর
আমরা গানে মাতলাম, কেউ কেউ পানেও
কেউ-বা গানের বক্ষে কানটাকে শুইয়ে আঁখি মুদলেন
আর আমাদের রুমাদি ওড়ালেন অদৃশ্য রুমাল

ক্রাচ ছুড়ে ফেলেই ছুটলাম কলকাতায়
এইবার ঠিক আমাদের ওড়ার সাধ পূর্ণ হবে
রুমাদির মতো এমন উভচর পাখি আর একটাও দেখিনি
শ্রাবণপেরুনো পাটুলির মাটি থেকে তখন অবাক পাটালির গন্ধ
ভাদ্র ভদ্রোচিত বর্ষণে আমাদের খানিকটা ভেজালো
তারপর আকাশপ্রদীপ খুলে দিল কবিতা ও সুরসন্ধ্যা
আমরা সুরা পান করলাম হাসিখুশি কিছু কবিতার
আমরা সুর পুরে নিলাম অতুলপ্রসাদের, আর কোন্ ফাঁকে
জাদুকরের মতো রুমাদি তার অলৌকিক ভাণ্ডার থেকে
বের করতে লাগলেন একের পর এক
পুষ্পমাল্য
বরমাল্য
পুষ্পিত চুম্বন

নক্ষত্রঅক্ষর
সম্বিৎ ফিরলে নিচে তাকিয়ে দেখি ভাসছি হাওয়াসাম্পানে
আর আমাদের পায়ের নিচে কলকাতার প্রাচীন আকাশ
রুমাদির মায়াবী হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝলমল করে উঠছে...

মামুন খান

গদ্যপদ্য ভ্রমালয়

জীবন ছিল
পাখির মতো
উড়াল পদ্যময়।
খড় এসে ডালের প্রশ্রয়ে
বাঁধিলো এক
গদ্যপদ্য ভ্রমালয়।

তা
তে

(তাতে, বন্দনা মার খেলো।)

উত্তরে নহে মঙ্গোলিয়া
নহে হিমালয়।
দক্ষিণে নহে অনন্তজলধি
এমনকি, হাতিয়াও নয়।

এমনকি, আমরা, বলছি–
ভাসিয়া আসি নাই, যুগল প্রেমের স্রোতে,–

তবুও আমরা নিরালায়, সেই পাখির জীবনই আঁকছি...

আমিনুর রহমান সুলতান

লাশ, কাঠ ও আগুনপ্রতিভা

মানুষ মরে লাশ হয়;
গাছ মরে কাঠ।
সব গাছ হয় না কাঠ;
নন্দনশোভা...

মানুষও তো তাই
কোনো কোনো লাশ ও কাঠে থাকে
ভেতরে আগুন
আগুনপ্রতিভা...

তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধ

আনন্দধ্বনির ওপর পড়ে রইল বন্ধুদের শব, তুমি বেঁচে রইলে।
যে-কেউ এভাবে বাঁচে–সন্তানের শাপ শুনতে শুনতে–যে-কেউ
হত্যার আওতায় আনে ছায়া, সাহসে কুলোয় না দেখে সামান্য
হতাশ, ভাবে ঢের বৃদ্ধ হয়ে গেছে দিন, রাত বাড়লে ভেবে দেখা যাবে।
আনন্দধ্বনির ওপর পড়ে রইল বন্ধুদের শব, বন্ধুদের শবের ওপর
আনন্দধ্বনি, তুমি জেগে রইলে... জোর গলায় কাদের বোঝাও জীবন,
কাদের মৈথুনমুহূর্তে শিউরে ওঠো, কাদের চোখ তোমার সর্বস্বে পড়ে আজ?

প্রকাশ্যে ছিলে না আগে; কত সন্ধানী ভিক্ষুকের পা তোমার চৌকাঠ
মাড়ানোর পর ধাতব হয়ে গেছে বোধিস্পর্শে, কত গণিকার চোখে
আঙুল ঠেকে গেলেই শুরুতে মূর্ছার শব্দ, তারপর তৃপ্তিময় কান্নার রাত!
এখন অগম্য ছায়ার নিচে দীর্ঘ শ্মশান বরাবর বন্ধুদের শব,
সর্বস্বের ওপর চোখ ফেলতেই সন্তান অন্ধ হয়ে গেল, তুমি চেয়ে রইলে।

আনন্দধ্বনির ওপর ভেসে রইল দিনের শব, তুমি মৃদু মৃদু হাসছ...
অন্য কোনো গতি নেই, শব্দ নেই, শুধু কৃষ্ণ রাত বেজে ওঠে–
'নিজেই নিজের রক্তে প্রতারিত যম হয়ে আছ।'

শতাব্দী জাহিদ

পেইন

তোমাকে আর লিখব না বলে–
শুকনো লংকা, মোরব্বা, চেপাশুঁটকি তুলে রেখেছি–বস্তায়
আবার লম্বা বারান্দা হরিৎ শূন্য করেছি–সেও বেশ ক'দিন।
প্রথম প্রথম ঠাওর পাইনি চড়ুই, কাক, চ্যালা, লাদার পাল–
এখন শুনশান বারান্দায় দোল খায় রঙিন ক্লিপ।

তোমাকে আর লিখব না বলে–
ভাদ্রের তপ্ত বাতাস থেকে আবিষ্কারে মশগুল অ্যালকহলিক দৃশ্য
নির্মিত ভালোবাসতে না থাকা, ভুলতে থাকা বাঁচার চলচ্চিত্র।

তোমাকে লিখব না বলে–
হাজার বছরের নিদ্রাহীন চোখ কয়লায় ঘুমায় কদাচিত।
ঈশ্বর সাক্ষী তোমাকে নিয়ে আর লিখব না বলে–
ম্যাগনিফাইংয়েও এই কবিতার কোথাও তুমি নেই–
একদম কোথাও

শিলাদিত্য হালদার

অব্যক্ত

দ্বার থেকে দরজায়
অনিদ্রায় অনশনে ফিরেছি বারবার
বিফল আকুতি ক্লান্ত হয়ে
করেছে মৃত্যুবরণ
ঐশ্বর্যের দেয়ালে ধরেনি চিড়
ক্ষণিকের অহংকার করেছে গ্রাস
অনির্বচনীয় বেদনা ফেলছে বিষনিশ্বাস।

চিতাভস্মের আগুন টিমটিম জ্বলছে
হঠাৎ ঝড়–সবকিছু এলোমেলো
সময়ের সাক্ষী শুধু আমি
নীরবে, নিভৃতে কাঁদছি, ভাবছি;
তোমাদের নেই কোনো শেষ–

চিরনিদ্রার পরে মিটবে কি গভীর ক্ষত?
জবাবটা রইল অব্যক্ত!

লেবিসন স্কু

প্রসঙ্গ মিমি

আজকাল হুটহাট ইচ্ছে হয়
পাহাড়কে উপুড় হয়ে দেখতে
তখন কেমন লাগবে
বুনো ফুলগুলো
মিমির লাল-নীল পাখনার মতো
নাকি এর চেয়েও আরও সুন্দর!

প্রায়ই ঝর্নাকে
দীর্ঘশ্বাসের কথা বলি
প্রসঙ্গত মিমি
ইদানীং সে হাওয়ার
ইউনিফরম পরে সম্মুখে আসে
সাহস নিয়ে বলতে পারি না
ভয় হয়! [ভয় হওয়া স্বাভাবিক]
তোমার ওমুক ও তমুককে
ফুলের চেয়েও সুন্দর লাগে!

হাসান মুস্তাফিজ

দেবী রায়ের পক্ষে বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক সমালোচনা

(কবি দেবী রায়ের প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

ভীষণ সহস্রাধিক রোদ, তাওরাতের অস্ত্ররাত
বিনাশ নাই এসবের বসু সাহেব, আপনি দোষী
ব্লিচিং করে ইয়াং ইয়াং সব পেডোফাইলদের
কোমর ভাঙার পর হুইলচেয়ারদের আসামি
লাগে, কিন্তু অজৈবরা কোনো সিক্রেট জানে না।

বসু সাহেব, খাঁচার চেয়ে টর্চার ভালো, টর্চারের চেয়ে
একাকিত্ব অসংলগ্ন, যদি জীবনানন্দ দাশের মেসের ছাড়পোকা দেখেন।
বসু সাহেব, বৈদেশিক সিনেমার রিমেক হলেই সিনেমার স্ক্রিনপ্লে দূষিত হয় না,
তবে অভিনেতাগুলার জন্য মায়া লাগে–ব্যক্তিত্বের রিমেক নাই না আছে?

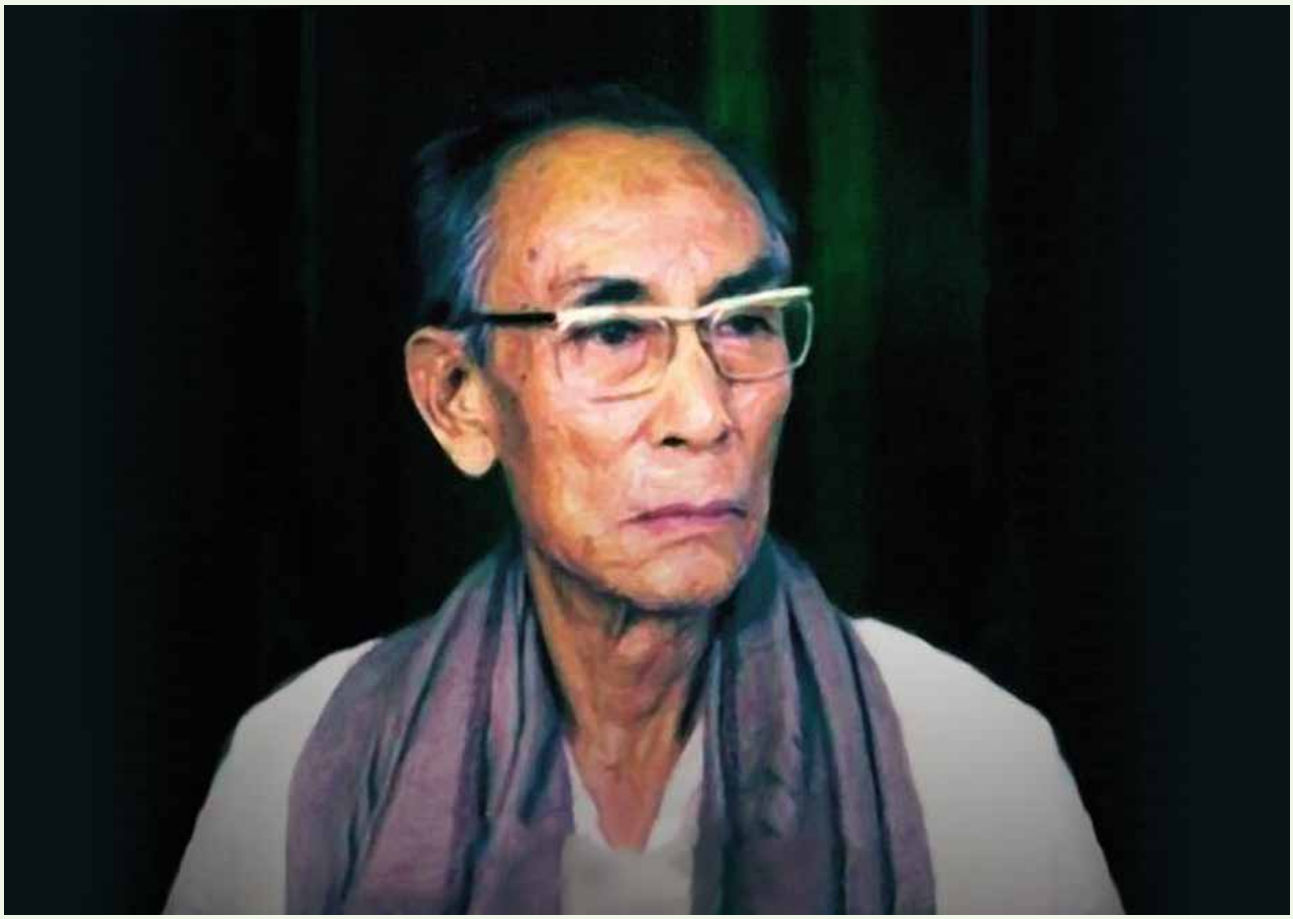

প্রবন্ধ

কানুর বংশীধারী শচীন কর্তা

ওয়াহিদুর রহমান শিপু

শচীন দেব বর্মন ছিলেন ত্রিপুরার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মহারাজ নবদ্বীপ কুমার দেব বর্মন বাহাদুরের পুত্র। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। তৎকালীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার রাজপরিবারের নয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মা ছিলেন মণিপুর রাজবংশের মেয়ে নিরুপমা দেবী। ১৯২০ সালে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএতে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে মুম্বাইয়ে বসবাস করতে শুরু করেন

ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন শচীন কর্তা। ১৯৩৪ সালে অল ইন্ডিয়ান মিউজিক কনফারেন্সে গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ঠুমরি পেশ করে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকেও মুগ্ধ করেছিলেন। কেবল সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নয়, গীতিকার হিসেবেও তিনি সার্থক। তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন নিপুণভাবে।

শচীন দেব বর্মন এই তুলে রাখা নামটি শচীন কর্তা নামের দাপটে মিইয়ে গেছে। বাঙালির কাছে তিনি সম্মাননীয় শচীন কর্তা হিসেবেই আদ্রিত। সব মিলিয়ে তাঁর যে জীবন তা অত্যন্ত সিনেমাটিক কিংবা অনেকটা উপন্যাসের বিন্যাসে রচিত। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সিংহাসনবঞ্চিত শরিকদের সন্তান তিনি। পিতা স্বেচ্ছানির্বাসনার ঘর বাঁধেন কুমিল্লায় অনেকটাই অভিমানে। রাজকীয় তকমা-উপাধিতে ভূষিতও হননি। তখন ঐশ্বর্য অনেকটা ক্ষীয়মাণ তবে পারিবারিক আভিজাত্য ছিল ঠিকই। এই বিষয়ে শচীন কর্তা বলেন... ‘রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, যাতে আমরা তাঁদের মতে যারা সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনো দিন মেনে নিতে পারিনি। কেন জানি না জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির

টান অনুভব করে মাটির কোলেই থাকতে ভালোবাসতাম। আর বড় আপন লাগত সেই সহজ সরল মাটির মানুষগুলোকে, যাদের গুরুজনেরা বলতেন সাধারণ লোক। যাই হোক অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই। মাটিগন্ধা সুরের প্রতি রাখালি বাঁশির প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জেগেছিল মাটির অমল মানুষের সান্নিধ্যে এসেই। অবশ্য তাঁর রক্তে রন্ধ্রে মিশে ছিল সুর আর গান। শচীন কর্তার জবানিতে পাওয়া যায় 'সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানি, কুমার, কুমারী, থেকে দাস দাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই–এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার চাষিরা চাষ করতে করতে গান গায়, নদীর জলের মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে পারে না। জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার গানের গলা ভগবৎ প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মানুষ। তাই বোধ হয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।' (সরগমের নিখাদ) একটি কথা প্রাসঙ্গিক যে শচীন কর্তার গানের আগে একটি বাঁশি পর্ব ছিল। সুরের দেশে বংশীবাদক কুমার শচীন যেন স্বয়ম্ভু কৃষ্ণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সঙ্গীত সাধনার শুরুতে এই বংশীবাদন তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তাই দেখি তিনি বাঁশি নিয়ে ১৮টি গান কণ্ঠে ধারণ করেছেন। সঙ্গীতের কুমার বেছে নিয়েছিলেন মাত্র ১৮টি গান যা প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেষ্ঠ বাঁশির গানগুলোর যা বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রাণ। কুমিল্লার প্রতিটি গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, তিতাস, পদ্মা, মেঘনা, গোমতীর তীরে প্রাণ সঞ্চালন করে এই বাঁশি, যেন সঙ্গীতের কুমারের মতো গেয়ে ওঠে স্বর্গীয়ভাবে। গানগুলো নিম্নরূপ–

১. তুই কি শ্যামের বাঁশি রে ঘরের বার করতালি বাঁশি আমারে, ২. বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি, ৩. ওও বাঁশি! আল্লার দোহাই ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া পান খাইয়া যাও, ৪. সেই যে দিনগুলি বাঁশি বাজানোর দিনগুলি, ৫. অসময়ে বাজাও বাঁশি প্রাণ তো মানে না রে কালা, সময় মানে না, ৬. কোন সুদূরের বাঁশির টানে কোথায় যাবে কে জানে, ৭. বাঁশি আজ কেঁদে কয় কভু সে তো দূরে নয়, বালুচরে মোর, ৮. বন্ধু বাঁশি দাও তোর হাতে তে, ৯. বাঁশরিয়া রে, কোথায় শিখেছ বাঁশি বাজান, ১০. না না ফুটনারে ফুল, না না উঠনারে, এখনো বাঁশিতে সুর শুনিনি, ১১. একমনে শোন মরমে তার মুরালী বাজে, ১২. মায়াবী কানুর বাজে বাঁশি, ১৩. বাজে না বাঁশি গো, ফুলের বাসরে জাগে না হাসি গো, ১৪. আমারি জীবনে যে বাঁশি তব মরমে এলে কি প্রভু, ১৫. তুমি শ্যামের বাঁশি, ১৬. বাঁশি তোমার হাতে দিলাম, ১৭. ফুলের বনে থাকে ভ্রমর... শুনবে যেথায় বেভুল বাঁশি, ১৮. বাঁশরি বাজালে কুসুম জাগালে।

শচীনকর্তার এই বাঁশির প্রেমে বারবার উঠে এসেছে ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা ও গ্রামীণ আটপৌরে নরনারীর বিরহ-প্রেমের কথা। বংশীদাস শচীন এই একটি বার্তা দিচ্ছেন যেটা শ্রোতাকে মিলিয়ে দেয় স্রষ্টার সঙ্গে। স্রোতা আর ঈশ্বর আলাদা হতে পারেন না। যখন শচীনের মিঠা উদাসী সুর শ্রোতাদের কানে পূর্ণাঙ্গ গীত হয়ে ধরা পড়ে তখন তাদের হৃদয়ে ভগবান কৃষ্ণের বাঁশির সুরের মতোই অণুতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তাঁর সঙ্গে যারা সুর দিয়েছিলেন যেমন হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, সেমেন্দ্র পাল, কাজী নজরুল ইসলাম, এরা শচীন কর্তাকে শনাক্তকরণে সমর্থ হয়েছিলেন। উনি ছিলেন সুরের বরপুত্র। সুর সর্বদাই তাঁর কাছে এসে ধরা পড়ত। রাজ সিংহাসন তিনি অগ্রাহ্য করে সুরের রাখাল রাজা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে লোকসঙ্গীতজ্ঞ মুস্তাফা জামান আব্বাসি বলেন, 'পৃথিবী ঘুরে এলাম। সবচেয়ে ভালো লাগল কেনিয়ায় গিয়ে, সেখানে জালালুদ্দীন রুমীর বাঁশি শুনে পৃথিবী হলো পাগল। রুমি বললেন ঐ বাঁশি তালাশ কর ইথার সমুদ্র থেকে। তোমার হৃদয় নেচে উঠবে গ্রহ তারা শশীর সঙ্গে নৃত্য সমবেত হও। মানুষকে ভালোবাস, ক্ষোভ কমাও, তুমি পৃথিবীতে একবারই এসেছ। যদি বাঁশি শুনতে না পার, ভান কর, দেখবে তুমি ঠিকই বাঁশির সুর শুনতে পাবে। লিখলাম *রুমীর অলৌকিক বাগান*। পাঠকরা জানতে চাইলেন আপনি সত্যি রুমীর বাঁশি শুনতে পেয়েছেন? উত্তর দিলাম না শুনতে পেলে ঐ বইটি লিখলাম কেমন করে? রুমীর স্বহস্তে লাগান বাগানে অতিথি আমি। যখন খুশি যেতে পারি আমার হৃদয়তন্ত্রীতে রুমীর বাঁশি। যে বাঁশির সুরের সঙ্গে সংযোগ এমন বাঁশির যা আমার নিজস্ব ঐটিই শচীন কর্তার। তাই এই শেষলগ্নে এসে তার কথা বলতে বসলাম।'

একবার মনে করুন মিলনের কথা। সে তো ক্ষণস্থায়ী। বিরহ বিচ্ছেদ আমাদের জীবনে অমোঘ সত্য এবং এই সত্য সর্বাঙ্গসুন্দর। যদি বলি স্বর্গ তাকে অনুভবে অনুরণনে পাই এবং অবশ্যই তা বাঁশির সুরে।

বাঁশির সুরে হরিল
কেমন করে ঘরে থাকিবে।

শচীন গাইছেন? কাকে বলছেন ঘর থেকে বের হতে। অবশ্যই শচীনের মানসলোকে সপ্তসখী চূড়ামণি রাধারানিকে কি?

'লোকে বলে সবাই রাধা
শ্যাম পিরিতির ডোরে বাধা
রাধা শ্যামের বাধা বিচ্ছেদ নাই।'

কথাটি রাধা শ্যাম বিচ্ছেদের হাজার হাজার গানে যেমন পাই ঠিক এমনভাবে পাইনি। যিনি গানটি রচনা করেছেন তিনি সম্ভবত বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ বিচ্ছেদি গানের রচয়িতাদের একজন। অপর রচয়িতাটির নাম কাজী নজরুল ইসলাম, অপর সংগ্রাহকের নাম কানাইলাল শীল আর গায়কের নাম আব্বাসউদ্দীন আহমেদ। পরের লাইন–

'প্রেমেতে শ্যাম অঙ্গে মিশে গেছে রাই
তবু তো রাধা শ্যামের ছাড়াছাড়ি নাই।'

আচরণটি গেয়েছেন আবার এইভাবে
'রসরাজ শ্যামেতে জড়ান রসরাই
রাধা শ্যামের ছাড়াছাড়ি নাই।'

গানটি শেষ নয়, তদুপরি শ্রোতাকে নিয়ে যাবে সুরুজমুখি রাইয়ের কাছে তার কথাও আছে। এই গানে যে সুরুজমুখির কথা আছে তা লক্ষ করি শচীনের গানে। শেষাংশে কি বলছে শুনুন,

'এ প্রবাদ মিথ্যা হলো
কপাল দোষে মিথ্যা হলো
বুঝি রাহু গ্রাস করিল
আমার সোনার সুরুজমুখি রাই।'

এবার গায়ক নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, তিনি যেভাবেই হোক সুরুজমুখি রাইকে খুঁজে আনবেন।

'প্রাণের সুবল
আইনা দে আইনা দে
কমলিনী রাই
বিনোদিনী রাই
সোনামুখী রাই।'

গানটির যখন যবনিকাপাত ঘটল, তখন শ্রোতামহলে এক অনাবিল শান্তির বার্তা পৌঁছে গেল। এখানেই শচীন সার্থক কেননা গানে রাধাকৃষ্ণের গল্প ও মিথলজি এসেছে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনি ছাপিয়ে তাঁর গানে শুধু বিরহ বেদনা চাগিয়ে উঠেছে। এই বিচ্ছেদ ভাবনাবিশ্ব হলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সুর, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। তিরিশ থেকে ষাটের দশক ছিল বাংলা গানের 'সোনার দিন' প্রাণভরে আধুনিক বাংলা গান শোনার দিনও। আর বাংলা গানের সেই সোনার দিনের নির্মাণ যাঁদের হাতে হয়েছিল তাঁদের এক অন্যতম অগ্রজন ছিলেন শচীন দেব বর্মন। আধুনিক বাংলা গানের অনেকটাই তৈরি করে দিয়েছিলেন শচীন দেব বর্মন। হওয়ার কথা ছিল ত্রিপুরার রাজা, হয়ে গেলেন আধুনিক বাংলা গানের বংশীধারি রাজা। 'সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল' আজও যে গান তাঁর সুরের মায়ায় আমাদের দুলিয়ে দেয়। দৈনন্দিন প্রেম-বিরহ ভগবান কৃষ্ণের বাঁশি শুধু নয় তাঁর গানে স্বামীর ঘরে গ্রামীণ বাংলার বন্দিনী নারীর যে ভেতর থেকে ফেনিয়ে আসা আকুতি ভাইয়ের জন্য মায়ের জন্য।

'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া/ আমার ভাইধন রে কইয়ো নাইওর নিতো বইলা/ তোরা কে যাস কে যাস...'

ওয়াহিদুর রহমান শিপু
কবি ও কথাসাহিত্যিক

অচল মানুষ

মঈনুল হাসান

ছোটগল্প

দোতলার বারান্দা হতে নিচের দিকে চোখ নামাতেই গেটের কাছে একটা ছায়ার মতো দেখলেন আনোয়ার হোসেন। তাঁকে দেখে ছায়াটা দ্রুত সরে গেলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। কে রে ওখানে? কার পায়ের আওয়াজ আসছে নিচ থেকে? ঠিকমতো আলো ফোটেনি তখনও। মাথার ওপর অর্জুন গাছের ঝোপালো ডাল। সেই ডালের নিচে কিছুটা অন্ধকার তখনও গুটিশুটি হয়ে থমকে জমে ছিল। দু-একটা পাখি ডাকছে কোথাও। ঝিরঝিরে হাওয়ায় চোখ সরু আর কান সতর্ক করে আবারও শুনলেন সেই চাপা খসখসে আওয়াজটা। তখনই মানুষের ছায়ার মতো কিংবা ছায়াধারী কিছু একটা তাঁর পশ্চিমের পাঁচিল টপকে হাওয়া হয়ে গেল মুহূর্তে। চারদিকে গাছগাছালির ঘন ছায়া। তিনি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন শুধু কে একটা দৌড়ে হারিয়ে গেল তরতরিয়ে। ছিঁচকে চোর-টোর হবে হয়তো! তাঁর বাড়িতে কী এমন আছে যে লুট করে নেবে! বাড়িটা পুরানো–ইটের ফাঁকে ফাঁকে জমাট শ্রম আর জমানো কিছু মনস্তাপ ছাড়া আর কিছু নেই। সম্পদের মধ্যে আছে পাঁচিলঘেঁষা হরেক জাতের গাছগাছালি। সেটাই রোজ প্রশান্তি আনে তাঁর। এসব ভাবতে ভাবতেই সামনের বাড়ি থেকে ডেকে উঠল সফেদ মিস্ত্রির মোরগ। ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন জেগে ওঠেন আনোয়ার হোসেন। কাক ডাকা বললে ভুল হয় অবশ্য

কারণ তিনি যে সময়ে জাগেন তখন অন্ধকারও জেগে উঠে পাতলা হতে শুরু করে। ভোরের এ সময়টায় তাঁর শরীর থাকে ঝরঝরে, মেজাজ থাকে প্রসন্ন। তারপর তিনি যখন দখিনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে গলির রাস্তাটা দেখতে থাকেন তখনই আলো ফোটে। তবে প্রায়শ যে ঘটনাটা ঘটে তা হলো প্রতিদিন এ সময়ে সফেদ মিস্ত্রির মোরগটা ডেকে ওঠে তারস্বরে। আনোয়ার হোসেন ভাবেন, মোরগটা এখনও গেঁয়োই রয়ে গেল। কারণ শহরে যে ঘুম থেকে জাগবার নানাবিধ উপকরণ আছে তা মোরগটা জানে না। স্বভাববশে প্রতিদিন ওটা ডাকে আর খুব বেমানান ঠেকতে থাকে আনোয়ার হোসেনের কাছে। মাঝেমধ্যে তাই তাঁর মনে হয় তিনি আর ওই মোরগটা ছাড়া এ গলিতে বুঝি আর কেউ জাগে না।

গত কয়েক রাত ধরে আনোয়ার হোসেনের ঘুম হচ্ছে না ঠিকমতো। একটা দুশ্চিন্তা আঁটসাঁট হয়ে চেপে বসে আছে মাথায়। সারাজীবন ধরে যে টাকাকড়ি জমিয়েছিলেন আর অবসরের পর যেটুকু পেয়েছেন সবটুকু দিয়ে বাড়িটা করেছিলেন। ছয়তলা ভিতের ওপর চারতলা পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছেন কোনোরকমে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি থাকেন দোতলায়। তিন ও চারতলায় ছাদ আছে মাত্র। তাছাড়া টাকার সংকুলান হয়নি বলে চারদিকটা এখনও প্রায় অরক্ষিত। সেখান দিয়ে কুকুর-বিড়াল, সাপ-বেজি, চোর-ছ্যাঁচড় এমনকি অযাচিত মানুষেরও অনায়াস আনাগোনা চলে। তিনি জানেন, বেঁচে থাকলে আত্মীয়-পরিজন কিংবা সংসারের চিন্তা বাদ দেওয়া যায় না। সেই চিন্তার সাথে আজকাল জোট বেঁধেছে সীমানা দেওয়ালবিহীন বাড়িটাও। অথচ বাড়ি আর সংসার নিয়ে তার এসব চিন্তার কোনো অংশীদার নেই। তার সহায়-সম্পত্তির অংশীদার থাকলেও চিন্তার অংশীদার কেউ হতে চায় না। তিনি আর কদিনইবা বাঁচবেন! ছেলেরাও হয়েছে তেমনি। দু ছেলের মধ্যে কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

স্ত্রী রাবিয়া বেঁচে থাকলে বলতো, অত চিন্তা করার কী আছে? বাদ দাও তো! নিজের বাড়ি–আমাদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই তো হলো! অনেকের তো সেটাও থাকে না। আমরা অনেক সুখেই আছি।

হ্যাঁ, সুখেই আছি... সেই সুখের চিন্তা করে করেই তো জীবনটা শেষ হলো আনোয়ার হোসেনের। নিজের অর্থ-সম্বল-সচলতা হারিয়ে এখন তিনি ছেলেদের মুখাপেক্ষী। কথাটা রাবিয়া বুঝলেও তাঁর ছেলেরা বুঝতে চায় না সেভাবে। তাই ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ার মধ্যেও কিছু চাপা বেদনা আর দুশ্চিন্তা দীর্ঘশ্বাসের সাথে এসে মিশে যায় গোপনে।

ভোরের আলো ফোটার পর আনোয়ার হোসেন নিচে নামলেন। নেমে প্রথমেই তাঁর চোখ গেল গ্যারেজ আর গেটের ওপর জ্বলতে থাকা বাতির দিকে। এখনও নেভানো হয়নি। তিনি এটাও নিশ্চিত জানেন তিনি যদি না নেভান সারাদিন তা জ্বলতেই থাকবে। এ বাড়ির সবাই মনে করে অবসরের পর তাঁর কাজটাই-বা কী? বাড়ির কর্তা হিসেবে এসব তো তিনিই খেয়াল রাখবেন। আবার সামান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেও বিপদ। তখন আবার ভাবে, রাতদিন সকলের ওপর নজরদারি আর খুঁত ধরা ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই তাঁর। সংকটটা দুই দিকেই। তখনই গেট ঠেলে শেফালি ঢুকল ভেতরে। সেও এ বাড়ির একজন সদস্য। রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করা এ বাড়ির বাঁধা মানুষ।

খালু, এই সাতসকালে কই যান? আপনার তো কয়দিন ধইরা শইলডা ভালা না।

জবাব দেওয়ার আগেই আনোয়ার হোসেনের ভ্রু কুঁচকে ওঠে। নিশ্চয়ই কাল রাতে মূল গেটে তালা লাগানো হয়নি। এটাও তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়। ওপর-নিচ মিলিয়ে এতগুলো মানুষ থাকে। নিরাপত্তার ব্যাপারটা কারও মাথায় থাকবে না? সব দায়িত্বই তাঁর? এ নিয়ে যদি উচ্চবাচ্য করেন তবেই শুনতে হবে রূঢ় কথা। তিনি দু একদিন খেয়াল না রাখলেই এমন ঘটনা ঘটে! আগেও ঘটেছে। খোলা দরজা পেলে চোর তো ঢুকবেই!

বিরক্তি মুছে ফেলে তবু বললেন, আমার খবর তোর না নিলেও চলবে। শোন, ওপরে ওঠার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে যাবি। আর পানির পাম্পটা ছেড়ে যাস। ঘণ্টাখানেক চলার পর মনে করে আবার বন্ধ করবি। একটু পরে সবাই ঘুম থেকে জাগবে। স্কুল আছে, অফিস আদালত আছে।

ক্যান, ঘরের কামও তো আছে খালু।

হুম, সে কথাই তো বলছি তোকে।

আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে আলাদা কোনো দারোয়ান নেই।ড্রাইভার হিসেবে রাখা ছেলেটা তিন তলার ছাদের নিচে যে টিনের ঘরে থাকে সেও কয়েকদিন হলো বাড়ি গেছে। সে থাকলেও না হয় হতো!

আইচ্ছা, খালু। আপনি তাড়াতাড়ি ফিরা আসুইন। আমি যাইতাছি উপরে।

শেফালি পাম্প ছেড়ে ওপরে গেল ঠিক। কিন্তু বাতিগুলো আর নেভাল না। আনোয়ার হোসেনের মনে হলো, সকাল থেকেই এরা বুঝি আজ তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। অগত্যা বাতির সুইচ খুঁজে খুঁজে তিনি নিজেই সব বন্ধ করলেন।

আনোয়ার হোসেন অবসরে আছেন কিন্তু সংসার থেকে তাঁর ছুটি হয়নি। মাঝেমধ্যে সবকিছুতে নজরদারি করতে করতে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। তারপরও এদিক ওদিক থেকে শুনতে হয় তাঁর কাজটাই-বা কী? খবরের কাগজের পাতা উল্টানো আর টিভি দেখা ছাড়া। তাই তো সারাদিন সবার ওপর খবরদারি করে বেড়ান আর ছুঁতো খুঁজে বকাঝকা করেন।

খবরদারি তো করতেই হয়! যেমন পানির পাম্প ছাড়া হলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা চলছে। রিজার্ভ টাংকি ভরে পানি উপচে ভেসে গেছে নিচতলার সিঁড়িঘর। পানি ডিঙিয়ে সবাই চলে যাবে। কিন্তু কেউ বন্ধ করবে না। শেষে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাঁকেই পাম্পের সুইচ বন্ধ করতে হয়।

যদি বলেন, কীরে শেফালি! সুইচ অন করলি সময় করে সেটা বন্ধ করবি না? এটাও কি মনে করিয়ে দিতে হবে?

খালু, আমারে খালি ডাকেন। আমি একা হাতে কয়ডা সামলামু? সকালবেলা পাঁচজনে পাঁচরকম নাস্তা খায়। সবাইরে ঠিকমতো নাস্তা দেওন, রান্না করন আমার অত টাইম নাই। তাছাড়া রান্নাঘরে ঢুকলে আমার এইসব মনেও থাকে না। আপনার সারাদিন কামডা কী? একটু খেয়াল কইরা...

তোর বড় আস্পর্ধা হয়েছে। এসব মনে থাকবে না কেন তোর? ঘণ্টাখানেক চলার পর একটু খেয়াল করে পাম্প বন্ধ করে দিলেই তো পারিস! এটা কোনো কঠিন কাজ না কি?

খালু, কী যে কন? আমি কি ঘড়ির দিকে চোখ থুইয়া কাম করি? আমি অত টাইম-টুইম বুঝি না।

তোর শুধু মুখে মুখে তর্ক আর বাজে কথা। বেয়াদব কোথাকার!

হইছে খালু, এইবার চুপ করেন... আর ভুল হইতো না।

শেফালির তারপরও ভুল হয়। নিজের মান-সম্মান ও তর্ক বাঁচাতে আনোয়ার হোসেন তাই নিজেই ঘণ্টা দুয়েক পরে পাম্প বন্ধ করার কাজটি করেন প্রতিদিন। কোনো হুজ্জোত-হাঙ্গামা নেই দেখে সকলেই মনে মনে খুশি। সিঁড়ি ভেঙে বারবার ওঠানামা করায় শুধু তাঁর হাঁটুর ব্যথা বাড়ে। শুধু তাই নয়। পানি নিয়ে আরও নানান সমস্যা নিজেই সামলানোর উদ্যোগ নেন আনোয়ার হোসেন।

প্রতিদিন চার থেকে পাঁচবার দোতলায় মোটরের সুইচ অন করে পানি ভরতে হয় ছাদের বিরাট টাংকিতে। বাড়িটায় এতগুলো মানুষ! সারাদিন ব্যবহারের পর দ্রুতই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। রাগী ষাঁড়ের মতো গরগর গরগর করে মোটর চলছে। কিন্তু সে চাবি বন্ধ করার আর খেয়াল থাকে না কারও। সেদিকে নজর দেওয়ার একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যায় না এ বাড়িতে। ফলে একবার মোটর ছাড়লে ছাদের টাংকি ভরে অনর্গল পানি পড়তে থাকে। টাংকি উপচে পানি পড়া দেখতে তাঁর কষ্টও লাগে ভীষণ। আর এতে কি শুধু পানির অপচয় হয়? বিদ্যুৎ-বিলের যে বিশাল অংক প্রতিমাসে গচ্চা দিতে হচ্ছে এটা কেউ বোঝে না।

ছোট ছেলেকে ডেকে একদিন বলেছিলেন, শোন খোকা... ছাদের টাংকিতে একটা মেশিন লাগিয়ে দে। আমি দেখে এসেছি পাশের বাড়ির আজগর সাহেব লাগিয়েছেন। অটোমেটিক সব ব্যাপার। কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই। কত দাম বা কোথায় পাওয়া যাবে তুই একটু খবর নে। পানির যা অপচয় হচ্ছে! দেওয়ালটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে রং খসে বাড়ির উত্তরের দেওয়ালে শ্যাওলাও জমেছে পুরু...

জহির, আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে বলল, বাবা, আমার হাতে একদম সময় নেই। তোমার কাজটাই-বা কী সারাদিন? তুমি একটু দেখো না। এমনি অফিসের কাজ নিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে আছি। মাথায় আর কিছু ঢুকাতে চাই না।

আমরা কি অফিস করে সংসারের কাজ সামলাইনি? তোদের মানুষ করিনি? তোদেরই শুধু কাজ?

উফ বাবা, তুমি খামোখা উল্টো বুঝছ। আমি মোটেও সে কথা বলছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে আমি দেখব।

না, থাক তোকে আর দেখতে হবে না। আমিই খোঁজ নিচ্ছি।

বাবা তুমি খামোখা রাগ করছ। অবসরের পর মানুষের রুটিনমাফিক আর কাজ থাকে না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাই অকারণে খিটমিট করে। তোমারও এখন সেই দশা। কত টাকা লাগবে আমি দিয়ে দেব। তুমি আজগর চাচা থেকে শুনে নিও।

ছাদের টাংকিতে সেই অটোমেটিক মেশিন সফেদ মিস্ত্রিকে ডেকে আনোয়ার হোসেন নিজেই লাগিয়েছেন। পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ লেগেছে সব মিলে। হাত পেতে সে টাকাও নেননি কারও কাছ থেকে। এখন কী শান্তি! মোটর ছাড়া আর বন্ধ করা নিয়ে বাড়তি কোনো হাঙ্গামা নেই। পানির অপচয় নিয়ে হৈচৈ নেই মোটে। আনোয়ার হোসেন খেয়াল করলেন বাড়ির সবাই রীতিমতো বিবেক-বুদ্ধির জায়গায় সেরকম অটোমেটিক সুইচ বসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনোদিকে তাদের দেখবার নেই। পানি নিয়ে সমস্যা মিটে যাওয়ায় কেউ আর জিজ্ঞেসও করছে না কীভাবে তার সুরাহা হলো? যেন এমনটা হবার কথাই ছিল। আশ্চর্য!

পানি নিয়ে হাঙ্গামার এখানেই শেষ নয়। দুপুরে খাওয়ার পর একটু ভাতঘুমের অভ্যাস আছে আনোয়ার হোসেনের। ঘটনাটি ঘটল হঠাৎ করে। একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলে শেফালি বলল, খালু, আমি অহন যাই। দরজা আটকাইয়া ভালো কইরা আপনি ঘুম দেন। সন্ধ্যায় আবার আসুম নে।

ঠিক আছে, তুই যা। খোকারা বোধ হয় খেয়েদেয়ে রাতে ফিরবে। তাছাড়া রাস্তায় যে ভোগান্তি! কয়টা বাজবে কে জানে? আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি চলে আসিস।

আইচ্ছা। বলে, শেফালি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গ্যারেজে দাঁড়ায়। একটা অপরিচিত ছেলেকে ঘুরঘুর করতে দেখল সেখানে। কিন্তু শেফালিকে দেখে তাড়াহুড়ো গেট পার হয়ে হনহন হেঁটে সোজা চলে গেল রাস্তায়। কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ দিল না। শেফালি একাই গজরাতে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল গেট টেনে।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ঘটনাটা ঘটল। জনহীন সুনসান বাড়িটায় তখনও বাতি জ্বালানো হয়নি। এই সুযোগে কংক্রিটের ছোট একটা স্লাব সরিয়ে চুরি গেছে পানির মিটার। আর ওদিকে একা বাড়ি পেয়ে গ্যারেজের তালা ভেঙে নিয়ে গেছে ভেতরের সমস্ত মালামাল। বাড়ির কাজের বেঁচে যাওয়া রড, পুরানো স্টিলের দরজা আর জং-ধরা লোহা-লক্কড় বেচলে ভালো টাকা পাওয়া যায়। আজকাল এসবের যা দাম!

সন্ধ্যায় আনোয়ার হোসেন যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখনই শুনলেন এই এলাহি কাণ্ডের কথা! নিজের ওপর ভারী আক্ষেপ হলো তাঁর। সবাই দাওয়াতে গিয়ে তাকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারায়। অরক্ষিত বাড়িতে চুরিটা হতোই যে কোনোদিন। তিনি কয়েকদিন থেকে এমন আলামতই পাচ্ছিলেন মনে মনে। কিন্তু সেটা আজই হতে হলো? তিনি জানেন আজ তাকে অনেকগুলো রূঢ় কথা শুনতে হবে। অপ্রস্তুত হতে হবে সকলের সামনে। এসব ভেবে ভেবে সন্ধ্যার এই বিষণ্ন সময়ে মনটা ভার হয়ে গেল আনোয়ার হোসেনের।

দুই.

হলুদ টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে আনোয়ার হোসেনের ঘরে। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বুকের ওপর দু হাত জোড়া করে চুপচাপ শুয়ে আছেন তিনি। চোখ বন্ধ থাকলেও চশমা খোলেননি। রাতের বেলা সবাই ফিরে আসার পর সন্ধ্যার চুরির ঘটনাটাই আলোচনায় এলো ঘুরেফিরে। দোষের আঙুলগুলো সব আনোয়ার হোসেনের দিকে। সেসব কথা শুনে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে কারও সাথে আর কথা বলেননি। ঘরের ভেতর হালকা শব্দ হতেই চোখ খুলে উঠে বসলেন। তাকিয়ে দেখেন বড় ছেলে দাঁড়িয়ে।

কোনো ভনিতা না করেই জামান বলল, যে দিনকাল পড়েছে একটা মস্ত বিপদ ঘটে যেতে পারতো বাবা! যাই হোক, না খেয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে আছ যে!

আনোয়ার হোসেনকে আগের মতোই চুপ থাকতে দেখে এবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, আসলে তোমাকে একা রেখে যাওয়াই মস্ত ভুল ছিল। বারবার সাধলাম আমাদের সাথে চলো। তুমি গোঁ ধরে থেকে গেলে। কী লাভ হলো? থাম তো খোকা। লাভ-ক্ষতির এত হিসাব আসছে কোত্থেকে? তাছাড়া আমি কি আগে থেকে জানতাম এমন কিছু ঘটবে? যা হবার হয়েছে। বাদ দে।

বাদ না হয় দেব বাবা। কারণ তুমি না থাকলেও এ চুরিটা হতে পারতো যে কোনোদিন। এখন দেখো কত ঝামেলা। পুরানো জিনিসপত্র না হয় খোয়া গেছে। কিন্তু ওদিকে পানির মিটার যে চুরি গেল! এখন জিডি করো, তারপর সেটার কপি নিয়ে অফিসে কমপ্লিন করো। তাছাড়া মিটার ইন্সপেকশনে যারা আসবে একগাদা এস্টিমেট বিল বানিয়ে হাতে ধরিয়ে দেবে। এদের ফেস করাও মুশকিল!

আনোয়ার হোসেন আর কথা বললেন না। ঘাড় গোঁজ করে বসে রইলেন চুপচাপ। মনে মনে ভাবেন ছেলেরা তো যার যার মতো অফিস নিয়ে থাকে। দিনের বেলা এ ধরনের কোনো অফিশিয়াল ঝামেলা হলে তাকেই তো সামলাতে হয়। জরুরি দরকারে ফোন করলে বলে, বাবা অফিসের মিটিং-এ আছি। তুমি একটু সামলে নাও তো।

পাশ থেকে বড় খোকার বউ বলে, বাবা আপনার তো সারাদিন তেমন কাজ থাকে না। আপনার ছেলেরা কত জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকে। ওদের সময় কোথায়? এখন যদি কোনো ঝামেলা হয় কে সামলাবে বলুন?

প্রচণ্ড রাগ হয় আনোয়ার হোসেনের। চেঁচিয়ে বলেন, আমার বাড়ি, আমিই সামলাব। তোমাদের কারও কিছু করতে হবে না। তোমরা এখন যাও...

আনোয়ার হোসেনের বুকটা মুষড়ে ওঠে। সত্যিই তো, সারাদিন খাওয়া-দাওয়া, শুয়ে বসে থাকা ছাড়া তিনি আর কী কাজ করেন! রাবিয়া চলে যাবার পর ছায়ার মতো যে সংসারটাকে আগলে ধরে রাখছেন সেটা বোধ হয় কারও পছন্দ নয়। বড় বউমা মানে রুবির কথাগুলো বুকের মধ্যে এসে কাঁটার মতো বিঁধে। হঠাৎ অপ্রস্তুত হবার কারণে মুখটাও কেমন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। কেন যে তিনি আয়েশ করে ঘুমাতে গেলেন! এই তো রুবি বলল, সারাদিন বসে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই। অথচ সংসারটাকে এগিয়ে নিতে একটু খরচ বাঁচাতে তিনি যে ছোট ছোট কাজগুলো করেন সেগুলোর কি কোনো মূল্যায়ন নেই? ঘরের মানুষের আশকারা পেয়ে শেফালিও আজকাল তাচ্ছিল্য করে কথা শোনাতে ছাড়ে না। তিনি কি অর্থহীন অচল হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন?

আনোয়ার হোসেনের অথচ দুদণ্ড বিশ্রাম নেওয়ার জো নেই। সংসারে সকল মৌলিক কর্মের দায় যেন তাঁর। নিজের সচলতা প্রমাণ করতে গিয়ে ছুটে বেড়ান এ-ঘর থেকে ও-ঘর। বিরামহীন বিচরণ নিচতলার গ্যারেজ থেকে ছাদের চিলেকোঠা পর্যন্ত।

কোনো স্নানঘরে বালতি উপচে পানি পড়ছে, কলের মুখ বন্ধ করা হয়নি। যাও, বন্ধ করে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, দিব্যি আলো জ্বলছে–পাখা ঘুরছে। প্রতিমাসে হাত গুনে কতগুলো টাকা–মাসিক বিলটা যে তাঁকেই দিতে হয়। যাও, উঁকি দিয়ে সেসব নিভিয়ে দাও। বাইরে কেউ এসে বেল বাজাচ্ছে। সবাই কানে শুনছে কিন্তু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে না। আনোয়ার হোসেনের কাজ কী, পত্রিকাই তো পড়ছেন। যাও, দরজা খুলে দাও। টেলিভিশনটা চলছে অকারণে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই। অগত্যা রিমোট খুঁজে টিভির সুইচ বন্ধ করা তাঁরই দায়িত্ব হয়ে যায়। পানির পাম্প খারাপ, শব্দ হচ্ছে ভীষণ–ছোটো সফেদ মিস্ত্রির খোঁজে। মেরামতের দায়টুকু কেউ নেবে না। গ্যারেজে ফিউজ কেটে অন্ধকারে ভুতুড়ে হয়ে আছে বাড়িটা। অন্ধকার হাতড়ে চললেও কারও মাথাব্যথা নেই সেদিকে। এ বাড়ির এমন অজস্র ছোট ছোট কাজ যেগুলো না কি আদৌ কাজ নয় সেটাই শুনল রুবির মুখ থেকে!

রুবি যখন বলে, বাবা আপনাকে দিয়ে একটা কাজ ঠিকভাবে হয় না তখন তাঁর আর কীই-বা বলবার থাকে? দিনে দিনে সবকিছুই বদলায়। এটা হয়তো তারই নমুনা।

রুবি অবশ্য আনোয়ার হোসেনের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে মাঝেমধ্যে। সব কথার শেষে চিন্তিত মুখে বলে, প্রতিদিন বলি বাবা আপনার বয়স হয়েছে। শরীরটাও খারাপ যাচ্ছে কদিন। সকালে অত অন্ধকার থাকতে না উঠে আরেকটু ঘুমালেই তো পারেন! আর বিকেলের দিকে না ঘুমিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করলে শরীরটাও সতেজ থাকবে। তখন নিচে থেকে শূন্য বাড়িটার দিকেও একটু নজর রাখা যাবে। আরও বড় বিপদ সামনে অপেক্ষা করে আছে কি না কে জানে!

প্রত্যেকে যার যার মতো পরামর্শ দিয়ে গেল আনোয়ার হোসেনের

দিনযাপনকে কেন্দ্র করে। তাঁরও যে কিছু বলার থাকতে পারে সেটা কেউ জিজ্ঞেস করল না একেবারে। তিনি যে এ সংসারেরই একজন। তাঁর অবর্তমানে সংসারের প্রাত্যহিকতা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে–অচল নয়, কিছুটা সচ্ছলতা হারাতে পারে এ বিষয়টা কেউ ভাবল না। নিজেকে খুব অথর্ব অকর্মণ্য মনে হলো তাঁর। একটা নিশ্চল বোধ তাঁর পা দুটোকে টেনে ধরে রাখে মাটির সাথে। চলৎশক্তিহীন আনোয়ার হোসেনের দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। অভিমানের অদৃশ্য সুতো তার ঠোঁট দুটো সেলাই করে রাখে শক্ত করে। তাঁর কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এমনকি ইচ্ছে করে না কারও মুখের দিকে গভীরভাবে চাইতেও। কারণ তাঁর চোখগুলো জলের ভারে টইটুম্বর হয়ে আছে।

সারাজীবন এ সংসারের ভালোর জন্য করেও সামান্য একটা চুরির ঘটনার দায় তাঁর অক্ষমতার দিকে তেড়ে এলো ভীষণভাবে। কী আশ্চর্য প্রতিদান বাড়ির মানুষগুলোর! সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই কারও। তিনি তো আর বাড়ির দারোয়ান নয় যে গেট পাহারা দিয়ে রাখবেন সারাক্ষণ। তবে সংসারের মানুষগুলোর ভালোমন্দ একটা কিছু ঘটে গেলে তিনি কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারবেন না। দায়িত্ববোধ হারাননি এখনও। মনের দিক থেকে আজও যথেষ্ট সচল তিনি। কিন্তু কদিন ধরে সবাই যেভাবে তাঁকে কথার তির ছুড়ে মারছে যেন তিনি একটা অবোধ অপ্রয়োজনীয় মানুষ। যে কোনো সময় একটা অমঙ্গল কিছু ঘটে যেতে পারে শুধু তাঁরই কারণে।

সেদিনের ঘটনার পর থেকে আনোয়ার হোসেন ঠিকমতো আর কারও সাথে কথা বলেন না। একটা বড় ধাক্কা খেয়েছেন। সেটা উপশম না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকাই শ্রেয়। প্রাত্যহিক রুটিনে খুব একটা হেরফের হয়নি তাঁর। আগের মতোই অন্ধকার থাকতে জেগে ওঠেন তিনি। সামনের বাড়ি থেকে সফেদ মিস্ত্রির মোরগও ডেকে ওঠে কুক্কুরু কু-উ-উ-উ...

একদিন সকালে হালকা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। শীতল মোলায়েম হাওয়া বইছে তিরতির করে। গেটের কাছে শব্দ হতে তিনি নিচে নেমে গেলেন। অর্জুন আর শিউলি গাছের ডালপালার আড়ালে ছায়া ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে।

না, মানুষই। বয়স তেরো কি চৌদ্দ হবে। মলিন জামায় ছটফটে এক মুখ, গভীর দুটো চোখ, শ্যামলা।

এই কে রে তুই? নাম কী তোর?

জাদু।

জাদু? না আর কোনো নাম আছে?

মায় তো জাদুই ডাকে।

এই ভোরবেলায় কোত্থেকে এলি? ভেতরে ঢুকলি কী করে? ভয় করে না তোর?

ও মা, গেট তো খোলাই ছিল। আমার কী দোষ?

আনোয়ার হোসেন মনে মনে ভাবলেন, গতকাল রাতে তিনি একটু আগেভাগে শুয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চিত এদিকে অন্য কারও আর চোখ পড়েনি। তাই সারারাত ওভাবেই খোলা ছিল গেটটা।

তুই কী করিস? পড়ালেখা না অন্যকিছু?

আমি ভাঙ্গারি টোকাই। আর মায় বাড়ি বাড়ি কাম করে। লেহাপড়া করি না।

সেদিন তাহলে তুইই দৌড়ে পালিয়েছিলি?

জাদু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মিটমিট করে হাসে। তারপর বলে, উপরে হঠাৎ দেখলাম কে জানি খাড়াইয়া আছে। তাই...

আনোয়ার হোসেনের মনে হলো, এই তবে সে! যার জন্য কয়েকটা দিন কী রূঢ় কথাই না শুনতে হয়েছে তাঁকে। সেটা তবে জাদুই। কিন্তু তাঁর রাগ হলো না একদম। বরং সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির সাথে কথা বলতে বলতে কেমন মায়াই লাগল। চোর বলে মনে হচ্ছে না মোটে। নিতান্ত অভাবের দায়ে না পড়লে... যাই হোক, এসব ভেবে কাজ নেই।

তারপর বলল, খবরদার এভাবে অন্ধকারে লুকিয়ে আর আসবি না। কিছু দরকার পড়লে আমার কাছে আসবি দিনের বেলায়।

আপনি সারাদিন বাড়িতে থাকেন? আপনার কোনো কাজ-কাম নাই?

না রে, আমার কোনো কাজ নেই। সারাদিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিই। তুই মাঝেমধ্যে চলে আসিস। তোর কথা শুনব।

ফিক করে হেসে ওঠে জাদু। আইচ্ছা, আসমুনে।

তুই কী চুরি করেছিস নিচ থেকে? তোর জন্য কত বকুনি খেলাম আমি! আবার যদি ধরা পড়িস এবার মারব তোকে। চুরি করা মহাপাপ এটা জানিস তো?

সব শুনে জাদুর মুখটা কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। অপরাধীর মতো ছলছল চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

তিন.

অনেকদিন চলে গেল। জাদুর আর দেখা নেই। আনোয়ার হোসেনের একবার মনে হলো, ছেলেটাকে দিনের বেলা আসতে বলে মনে হয় ভুলই হলো। সেদিন ওভাবে মুখোমুখি দেখা হওয়ায় হয়তো লজ্জা-সংকোচে পড়ে এখন আর কোনো খবর নেই ছেলেটার। তিনিই-বা আবার এমন ভাবছেন কেন কে জানে!

ঠিক তার দুদিন পরে আবারও ভোরের দিকে জাদু এসে হাজির। আনোয়ার হোসেন বারান্দা থেকে খেয়াল করে গুটিগুটি নরম পায়ে নিচে নেমে গেলেন। আশ্বিনের সকাল। বাইরে রোদ নেই। দিনের শুরুটা সকাল হতে চাইলেও চারদিকে মেঘের আনাগোনা কেমন সন্ধ্যা নামিয়ে আনছে। কদিন থেকেই এমন হচ্ছে। সাগরে নিম্নচাপ হতে পারে, নইলে শরতের আকাশ কখনও এমন হয়?

আনোয়ার হোসেন জাদুকে বললেন, কী রে তোর অসুখ করেছিল? কদিন যে দেখলাম না। আর তোকে না বলেছি এভাবে ভোরে আসবি না।

জাদুর মুখ কাচুমাচু। বলে, বাড়িত গেছিল মায়। আমিও গেছিলাম।

ও আচ্ছা। বলেই চোখ ফেরাতে দেখেন, পলিথিনে মোড়ানো কী যেন একটা জাদুর হাতে। হাতের মুঠোয় লুকাতে চাইছে প্রাণপণে। আর সে কারণে আওয়াজ হচ্ছে কচমচ করে।

হাতে কী তোর? অমন লুকাচ্ছিস?

আমগো বাড়িতে বিশাল কতবেলের গাছ আছে। মায় এক বস্তা নিয়া আইছে। এইহানে রাস্তায় বেচমু। আর ভাঙ্গারি টোকামু না। চুরিও করুম না।

তোর তো সুবুদ্ধি হয়েছে অনেক। যাক, বেশ ভালো।

আপনার জন্য দুইডা পাকা বেল লইয়া আইলাম। নিচের জিনিসগুলা তো কবেই বেইচা দিছি... তাই...

আনোয়ার হোসেনের মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দ আর অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় ছেয়ে গেল। এখনও পৃথিবীর সব মায়া বিলীন হয়ে যায়নি। কিছু দায়বদ্ধতা এখনও আছে। মাঝেমধ্যে খেদের বশে মেজাজ বিগড়ে উঠলেও এমন ছোট ছোট ঘটনায় আরও বাঁচতে ইচ্ছে করে। তিনি হাত বাড়িয়ে কতবেল দুটো নিলেন। জাদুর হাতের উষ্ণতা তাঁর হাতেও এসে লাগল। অকারণে তাই চোখ ভিজে উঠতে চাইছে।

আমার লগে যাইবেন? আপনার তো সারাদিন কোনো কাম নাই। কেউ বকবোও না। আমগো ঝুপরির পিছে শাপলা বিল আছে। হেই বিলের ধারে ঘুরমু...

একটুক্ষণ কিছু ভাবলেন আনোয়ার হোসেন। তারপর জাদুর মাথায় ডান হাত দিয়ে আলতো স্পর্শ করে মনে মনে ভাবলেন, ঠিকই তো তাঁর তো আসলে কোনো কাজ নেই। তিনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপাতত তাঁর মতোই আছেন। কিছুদিন অচল থাকলে ক্ষতি কী?

অখণ্ড অবসর নিজের মতো কাটাবেন বলে মনে মনে কত কী যে পরিকল্পনা ছিল তাঁর! এখন থেকে সেটাই তিনি করবেন। কেউ কখনও অনিবার্য হতে পারে না। সময় নিজেই দারুণভাবে সচল প্রত্যেকটি মানুষের কাছে। তারপর বললেন, ঠিক আছে, চল। আজ থেকে নতুন করে দিন শুরু হলো। কই নিয়ে যাবি দেখে আসি একবার।

গলি ছেড়ে তারা দুজন যখন বড় রাস্তায় উঠল পেছনে পড়ে রইল আনোয়ার হোসেনের কোলাহলহীন পুরানো বাড়িটা। মেঘ ডাকছে। হাওয়া বইছে। বাড়ি থেকে একটু দূরে বালুর মাঠ। ধোঁয়াটে মেঘ অতিক্রম করে কিছু রোদ এসে পড়েছে সেই মাঠে। সেখানে চিকচিক করে কাশফুল দুলছে হাওয়ায়। সকালের ঝাপসাটে অন্ধকার কখনও মুছে দিচ্ছে শরতের রোদ। ঘুম থেকে তখনও কেউ জেগে ওঠেনি। শুধু নিয়মমতো ডেকে উঠল সফেদ মিস্ত্রির লাল মোরগটা। •

মঈনুল হাসান
কথাসাহিত্যিক

অলংকরণ : মিজান স্বপন

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

একুল ওকুল, দুকুলই তার নেই। বিশ্বনাথ গায়েন জিজ্ঞেস করল, এদিকে তুমি আস নাই দাদা?

না, আমার ছিল সন্দেশখালি, ন্যাজাট অঞ্চল, তারপর খোঁচড় পিছনে লাগায় পুরুলিয়া। বিড়বিড় করে বলল সুশান্ত, হঠাৎ হাত ধরে ফেলল গায়েনের, আমরা মরে ছিলাম বিশ্বনাথ, জীবনের কোনো মানে ছিল না হে, একেবারে বদ্ধ জলা, পানাপুকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল, তুমি আমারে জীবন দিলে বিশ্বনাথ, নিয়ে এলে এখেনে, মনে হচ্ছে কিছু করার আছে, জীবন এত ফেলনা নয়।

সেই নদীঘাটের নাম লেবুখালি। লেবুখালি থেকে ভুটভুটি নৌকোয় চেপে তারা চলল মথুরগঞ্জের দিকে। মথুরগঞ্জ নয় যাচ্ছে দুলদুলি ঘাটে। দুলদুলি থেকে ভ্যান রিকশায় মথুরগঞ্জ। পৌঁছতে বেলা দুপুর। গাঙ পার হতে হতে সুশান্ত ভাবছিল, কতদূর আর কতদূর, এ এক সভ্যতা বিবর্জিত পৃথিবী যেন। মানুষ কতদূর কোথায় থাকে তা আন্দাজ করাও যায় না নগরে থেকে। মনে পড়ে সেই পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বন পাহাড়ের কথা। দশ বিশ কি তারও কম ঘর নিয়ে একটি গ্রাম। সারাদিন সেই গ্রামে অশক্ত বুড়ি আর বুড়োরা পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে দাওয়ার খুঁটো ধরে। কারো দুদিন ভাত পড়েনি পেটে, অপেক্ষা করছে ভাত নিয়ে আসবে ছেলের বউ কিংবা সোমত্ত মেয়ে

চাল-আটা নিয়ে ফিরে ভাত চাপাবে কিংবা আটা গুলবে বসে। পুরুষরা কাজে গেছে চান্ডিল কি টাটানগরের দিকে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। আবার যারা আছে, তারা সন্ধে হলে ঘরে ফেরে, ভোর হলে বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। দিনমানে থাকতে ভরসা কম। পুলিশ খোঁজ করে। কে এসেছে, কে এসেছিল গ্রামে খবর দাও।

মথুরগঞ্জ বাজারে এসে ভ্যান থেকে নামতে হয়। বাজারে পার্টি অফিসে পার্টির লাল পতাকা উড়ছে পতপতিয়ে। বিশ্বনাথ বলে, আইলায় বাজারও ডুবে গিছিল, ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি কেউ।

বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বনাথের সমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে, কী হলো গায়েনবাবু, কী মনে করে, ইনি?

বন্ধু, সুন্দরবন দেখতে এসেছেন, এদিকটা দ্যাখেননি। গায়েন বলল।

আইলায় সব শেষ হই গেছে, কী দেখতি এয়েচেন, রিপোর্টার নাকি?

বিশ্বনাথ গায়েন বলল, না, রিপোর্টার নয়, এমনি প্রাইভেটে চাকরি করেন।

সেই ব্যক্তি বলল, ইনি কি আপনার মতো, নকু ছিলেন, কোন প্রাইভেট?

বিশ্বনাথ চুপ করে থাকে। তখন সুশান্ত বোঝে জেরা আরম্ভ করেছে লোকটি। মথুরগঞ্জের পার্টি প্রধান। সে বলে উঠল, এস অ্যান্ড বি কোম্পানি, জাপানি ফার্ম।

লোকটি বলল, একটু আসবেন ভিতরে, বহিরাগত ঢোকায় একটু বিধি নিষেধ আছে, আমাদের সব জানতে হবে, সবদিকে একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে, মাওবাদি ঢুকছে নানা পরিচয়ে, পার্টি তা বলে দেছে, যা ঘটতেছে বুঝতি পারতেছেন তো, গাড়ি কারখানা হবেই, সব বদল হয়ে যাবে, আপনি কী বলেন, কার পক্ষে?

তখন সদ্য নির্বাচন শেষ হয়েছে। ভোটে সরকারের ছিল প্রবল জন সমর্থন। কিন্তু তার ভিতরেও বহুদিন বাদে চারদিক অশান্ত হয়ে উঠছিল। মানুষ পথে নেমেছিল জমি অধিগ্রহণের বিপক্ষে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর খবর হচ্ছিল বারবার। মিছিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সরকারের বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা ছিল অকল্পনীয়। চলছিল মিছিল আর সমাবেশ। সুশান্ত বেরিয়েছিল, হেঁটেছিল, ঘরেও ফিরে এসেছিল। তার মনে সন্দেহ ছিল, সেই সব মিছিল শেষ অবধি প্রতিবাদই হয়ে থাকবে, কেননা রাষ্ট্রশক্তি বড় শক্তি, রাষ্ট্র যদি চায় জমি নেবে, নেবেই। কে আটকাবে? জমি আন্দোলনে যে সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাদের বিরুদ্ধে জমিই হয়ে উঠেছিল প্রধান হাতিয়ার। তাদের ঢুকতে হয়েছিল পার্টি অফিসে। মধ্যবয়সী যে ব্যক্তি তাদের ডেকে নিয়ে গেল, তার টানটান চেহারা। শাদা ধুতি আর পাঞ্জাবিতে কোনো দাগ নেই। ধূর্ত চোখমুখ। সন্দেহপ্রবণ। কিছু সময় এলেবেলে কথা জিজ্ঞেস করে বলেছিল, দুশো টাকা রিলিফ ফান্ডে দিয়ে যান, মেয়েটারে নেছেন, ভাত দেবেন তো দুবেলা?

আঁজ্ঞে। সুশান্ত থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সব জানতি হয়, গাঁ থেকে একটা মেয়ে পাচার হই যাবে, জানব না, হয়? লোকটা খুব নিস্পৃহ কিন্তু কঠিন স্বরে বলেছিল।

গা ছমছম করে উঠেছিল সুশান্তর। সব জানে সেই পার্টিপ্রধান পরিতোষ মণ্ডল, গাঁয়ের সব খবর রাখাই তার কাজ। গাঁ থেকে একটি মেয়ে শহরে চলে যাবে ভাতের জন্য, সেকথা সে জানবে না তা হয় না। যাওয়ার ক'দিন বাদে জেনেছে, আগে জানলে ভাবত যেতে দেবে কি না। অভাবে গাঁয়ের মেয়ে কলকাতায় কাজ করতে যাচ্ছে, এই খবর গাঁয়ের পক্ষে ভালো না। অভাব তো নেই কোথাও। কত রকম প্রকল্প। অভাব হলো কল্পিত। টিভি আর খবরের কাগজের তৈরি। নির্দেশ আছে অভাবের অজুহাতে গ্রাম ছাড়া চলবে না। ছাড়তে দেবে না পঞ্চায়েত কাউকে। তবে যদি খবর না ছড়ায় ভেবে দেখা যেতে পারে। স্পেশাল কেস। তারা চুপ করে শুনছিল। সুশান্তর মনে হচ্ছিল সত্যিকারের শাসকের সমুখে বসে আছে। ক্ষমতার সমুখে বসে আছে। রিলিফ ফান্ডে টাকা নিল পরিতোষ মণ্ডল। টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল তারা। বাইরে এসে সুশান্ত অনেকটা সময় কথা বলতে পারেনি। পৃথিবী এক বিন্দুও বদলায়নি। কতদিন এই না বদলানো পৃথিবীটাকে দ্যাখেনি সে। তখন নীরবতা ভঙ্গ করেছিল গায়েন। যদি বলাইহরির হাতে দুশো টাকা বেশি দিয়ে আসা যেত, ভালো হতো। কথাটা বলেছিল গায়েন। টাকা দিতেই এসেছিল সুশান্ত। বেতনের টাকা অগ্রিম দিতে এসেছিল। আসলে তা নয়, মেয়েটাকে তাদের করে নিচ্ছে, সেই কৃতজ্ঞতায় কিছু দেবে লতার মা-বাবার হাতে। মেয়েটাকে তারা পড়াবে। বড় করবে। এইটা একটা মিশন। মথুরগঞ্জের মেয়ে জীবন আবার নতুন করে আরম্ভ করতে শেখাচ্ছে তাদের। হ্যাঁ, সময় ছিল অদ্ভুত। তখন যারা পথে নেমেছিল, তারা অনেক বছর আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল একবার। পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরেছিল। বয়সের অন্ধকার হাঁ-মুখে ঢুকে গিয়েছিল তারা। ঝিমিয়ে ছিল। এতদিন বাদে এমন কিছু হলো যে বেরিয়ে আসতে পারল। গাড়ির কারখানার হাঁ মুখ থেকে তিন ফসলি জমি রক্ষা করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সময়টা যেন ফিরে আরম্ভ করার মতোই ছিল। যুগ সন্ধিক্ষণ, সংক্রান্তি। অসফল আর পরাজিত মানুষেরা নতুন করে বেঁচে উঠতে চাইছিল।

ধ্বস্ত কুটিরের সমুখে নিমগাছের তলায় বসে নিতাইহরি জাল বুনছিল। তার ছেলে বলাইহরি গাঙে মাছ মারতে গিয়েছিল। নিতাইয়ের বউ পুষ্পরানি উঠনে চুলো জ্বালিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধছিল। তাদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েকে ফেরত আনল নাকি গায়েনদাদা?

কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল সুশান্ত নিজেই। টাকা দিতে এসেছে, সঙ্গে এক প্রার্থনা। প্রার্থনা না নিয়ে এলে হতো না? মেয়েটাকে পড়াবে, এর জন্য বলতে হবে কেন? সে তো মেয়েটাকে দিয়ে পাঁচবাড়িতে ঠিকে কাজ করিয়ে উপার্জনের কথা বলতে আসেনি? অভিযোগ নিয়ে আসেনি। কিন্তু টাকা নিয়ে এসেছে, তার মানে কি কিনে নিতে এসেছে? একেবারে কিনে নেবে। আর দেবে না। একটা পুরোন বেঞ্চি এনে দিলো পুষ্পরানি, বলল, ওরে কি রাখবা না গায়েনদাদা?

না না, তা কেন, তোমাদের মেয়ে খুব ভালো আছে, বলে উঠেছিল সুশান্ত, লতা খুব ভালো আছে, ওর ঠাকমাকে একটা শোক দিতে বলেছে, তিনি কই?

হাতনেতে আবছা আলোয় খুঁটি ধরে বসেছিল বুড়ি। হাঁচড় পাঁচড় করে নেমে আসতে আসতে বলেছিল, আমি ওরে ঘোমের ভিতর জানাই দেব বাপ, যমুনাবুড়ি কইছে, ঘোমের ভিতর রইছে, ঘোমের ভিতর কলিকাতা, বুয়াল মাছে পুঁটির মাতা।

পাঁচ.

মথুরগঞ্জ থেকে তারা হাসনাবাদ ফিরেছিল অনেক রাতে। অন্ধকারের নদী পার হয়েছিল গায়েন আর সুশান্ত। গায়েন চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল। তার এদিকে যাতায়াত আছে। সুশান্ত নিশ্চুপ অন্ধকারের নদীর দিকে তাকিয়েছিল। সেই যাত্রাটি অনেক সময়ের। চারদিকে স্রোতের শব্দ, বয়েই যাচ্ছে নদী। সুশান্তর আচমকা মনে হয়েছিল, যদি গাঙের পথ ভুল করে মাঝি। কোন অনন্তে চলে যাবে তারা। একটু দুরুদুরু ছিল বুক। বাড়িতে বহ্নি আছে, বহ্নির মেয়ে আছে। সে তো অনির্দেশ্য অন্ধকারে চলে যেতে পারবে না। মনে পড়ে সেই অন্ধকারে দশমাইল হেঁটে চাকুলিয়া রেলস্টেশন। হাঁটছে তো হাঁটছে। হেঁটেই যাচ্ছে। একা পাহাড়িয়া পথ। পথের শেষ নেই। পথে কুপিজ্বলা গ্রাম। সন্ধে হতে সব নিঝুম। আচমকা মনে হয়েছিল, যদি পথ ভুল করে অন্যদিকে চলে যায়! চাকুলিয়ায় অপেক্ষা করবে কমরেড সীতারাম। সীতারাম তাকে নিয়ে যাবে আর এক কমরেডের কাছে। সেই কমরেড তাকে নিয়ে যাবে আর এক গ্রামে। গ্রাম থেকে গ্রাম। সেখানেও অপেক্ষা করে আছে ভুখা মানুষ। এখন এক কমরেড অপেক্ষা করে আছে বেলঘরিয়ার পুরোন বাড়িটিতে। সঙ্গে আর এক নবীন কমরেড। এক যুদ্ধ থেকে আর এক যুদ্ধে এসেছে। কমরেড! আমরা সব ভুলে গিয়েছিলাম। আবার আরম্ভ করো, আবার। সংগ্রাম ফুরোয় না। যুদ্ধের শেষ নেই। পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বাড়ি ফিরেছিল লতার টানে। লতা, বহ্নিলতা। বহ্নিশিখা তার নামের প্রথম দু-অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে লতা বহ্নিলতা। লতার মতো জড়িয়ে থাক আমাকে। তোর নাম অগ্নিলতা বহ্নিলতা। সুশান্ত বসু বহ্নিশিখা বসুর কন্যা বহ্নিলতা মৃধা। লতা থাকল, বহ্নি থাকল, সবই থাকল।

মেয়ে বলল, বাবা, আমার বাবার সঙ্গে তুমার দেখা হলনি?

আমি তোর বাবা নই, বাবা সেই মথুরগঞ্জেই থাকে, শুধু তুই আর একটা মা পেয়েছিস। সুশান্ত বলেছিল শেষ বেলায় ফেরার সময় বলাইয়ের দেখা পাওয়ার পর তার মুখখানি মনে করে। বলাই সব শুনে বিষণ্ণ গলায়

বলেছিল, মেয়ে আমাদের থাকল তো দাদাবাবু?

তোমাদের মেয়ে কি আমরা নিতে পারি?

'থাকলি ভালো, পেথম সন্তান, আর সে মেয়ের অন্তরে বড্ড মায়া,' বলাই বলেছিল, 'তুমাদের আপন করে নেবে।'

সুশান্ত বলাইয়ের হাত ধরে ফেলেছিল, মেয়ে তোমাদের থাকল, আমরা কিছুই করতে পারিনি এ জীবনে, আবার একটা সুযোগ এসেছে।

তখন বিশ্বনাথ গায়েন আশ্বস্ত করেছিল বলাইকে, চিন্তা নেই বলাই, মেয়েটা বড় হবে লেখা-পড়া না শিখে, তাই কি হয়, ভয় নেই তোমাদের।

আমার ঠাকমা কি শোলোক দিল

সুশান্তর কথা শুনে মেয়ে হাসল, হুঁ, ঘোমের ভিতর দিবে, যমুনা বুড়ি অমনি, ঘোমে দিবে কেমনি...হি হি হি, আমি শোলক বললাম।

সেই বহ্নিলতাকে নিয়ে যেদিন তারা ঘরের বাইরে গেল, সেদিন শহর উত্তাল। দুদিন আগে যথেচ্ছ লাঠি পেটা করেছে পুলিশ সিঙ্গুরে। প্রতিবাদে মিছিল বেরিয়েছিল শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল গিয়েছিল ধর্মতলা। তারা কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছে দেখেছিল মিছিল আরম্ভ হলো। কলেজ স্কোয়ারের পেট থেকে মানুষ বেরিয়েই আসছে। অগণিত মানুষ! লতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। চোখের পলক পড়ে না। শক্ত করে চেপে ধরেছিল বহ্নিশিখার হাত, এত লোক।

হু, মিছিল। সুশান্ত বলেছিল।

আমাদের ওখেনে এত লোক নেই। মন্তব্য করেছিল লতা, এত লোক কোথায় থাকে মা?

বহ্নিশিখা বলেছিল, সবদিকে থাকে, সবদিক থেকে এসেছে, কলকাতায় এখন লোক আসছে সব দিক থেকে, ভয় ভেঙেছে মানুষের।

কিসের ভয় মা? জিজ্ঞেস করেছিল লতা।

ও তোকে বুঝতে হবে না। বহ্নিশিখা তাকে যেন আঁকড়ে ধরেছিল। ভয় হয়েছিল কি? মথুরগঞ্জের লতা, বহ্নিলতা তার হাত ছাড়িয়ে মিছিলে না ঢুকে পড়ে। মিছিলে মিশে গেলে আর কি খুঁজে পাবে? জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এখন কিছুই আর হারাতে চায় না সে। মিছিলে কি মথুরগঞ্জ, যোগেশগঞ্জ, বরুনহাট, হাসনাবাদ, বসিরহাট, হুগলী, পুরুলিয়া, বর্ধমান... সব জায়গার মানুষ আসেনি? এসেছে। তারা কি সুন্দরবনের বহ্নিলতাকে চিনে নেবে না। এই সেই মেয়েটা। আমাদের গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছে, ও মণি ভালো আছিস, পেটভরে খেতে পাস তো?

...আয় আয় আমাদের সঙ্গে আয়। মিছিল করে ফিরে যাব আবার পাহাড়তলীতে, গাঙের ধারে, যে যার ঘরে। ঘর থেকে একবার যখন বেরোতে আরম্ভ করেছি, আবার আসব, আবার।

মা, যাবে না? লতা তাকে টানছিল।

কোথায় যাবরে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল।

ওদের সাথে।

বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল সুশান্তকে, কী করবে?

সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নির মেয়েকে, কী করবরে?

মিছিলে যাব না? লতা জিজ্ঞেস করেছিল।

আজ না, আর একদিন। সুশান্ত বলেছিল, আজ বই।

মেয়ে বলেছিল, বই কিনে দেবে তো?

বই কিনতেই তো এসেছি। সুশান্ত বলেছিল।

আচ্ছা একটু দেখি মিছিল। মেয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছিল মানুষের সারি। পতাকা নেই। শুধু মানুষ। আর প্ল্যাকার্ড। কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু। মানুষ বেরিয়েই আসছে, বেরিয়েই আসছে। সুশান্তর কী মনে হলো মেয়েটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বহ্নি তাদের অনুসরণ করল। লতা অবাক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশচুম্বি বাড়ির দিকে তাকিয়ে। মিছিল হেঁটে যাচ্ছে ট্রাম লাইন মাড়িয়ে। কালো রাস্তা দাপিয়ে। মানুষের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মেয়ে মিছিলের এত কাছে এসে বহ্নিকে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়েই থাকল। সুশান্ত বলল, হয়েছে, ফেরো, চেনা কেউ দেখতে পেলে টেনে নেবে, আমাদের মেয়েই আমাদের মিছিল, ওর সঙ্গে হাঁটব।

একবার পা মেলাবে না? জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নিশিখা, লতা দেখুক।

সুশান্ত বলেছিল, অনেক হেঁটেছি, আজ বই নিয়ে বাড়ি ফিরব, যদি বলিস স্টেশন থেকে হেঁটে বাড়ি, মিছিলে বাড়ি।

বহ্নিশিখা চুপ করে গিয়েছিল। মিছিলে না গিয়ে মেয়ের বই কিনে তাকে নিয়ে ফেরত এসেছিল তারা বাড়ি। সন্ধে সন্ধে। ফিরে এসে দুজনে চুপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি হয়েছে ইদানীং কালে? জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রতিবাদ রাজপথে নেমে এসেছে। এমন প্রতিবাদ বহুদিন দ্যাখেনি তারা। কিন্তু শুধুই দেখল, দূর থেকে দেখে ফিরে এলো। মেয়ে। মেয়ে। মেয়ে। মেয়েটাকে নিয়ে মিছিলে যাবে না। অত মানুষ, ও যদি হারিয়ে যায়। তাইই কি? মেয়ে হারাবে কেন? হাত ধরে হাঁটত না হয়।

বহ্নিশিখা বলল, তুমি যেতে পারতে, আমি মেয়ে নিয়ে ফিরতাম।

সুশান্ত বলল, যা হয়নি, তা আর হবে না, মেয়েটা বড় হোক, কত মিছিলে যাবে।

তখন ফোন এলো ল্যান্ডলাইনে, আমি অনিমেষ বলছি সুশান্তদা, আমরা দেখেছি, আপনি শেষ পর্যন্ত ওই মিছিলে পা বাড়াননি, অভিনন্দন।

অনিমেষ সান্যাল শাসক দলের মুখপত্র, সংবাদপত্রে চাকরি করে। অনিমেষের সঙ্গে বছর দশের পরিচয় তাদের, সে বলল, আমি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব?

কেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

জমি নিয়ে যে আন্দোলন তা শিল্পের বিরোধী, আপনি একে সমর্থন করেন না, বলুন কিছু, কেন অসমর্থন। অনিমেষ জিজ্ঞেস করে।

আমি তো বলিনি সমর্থন করি না। সুশান্ত বিরক্ত হয়েছিল।

আপনি তো মিছিলে যাননি। অনিমেষ বলেছিল।

যাইনি মানে কি অসমর্থন? সুশান্ত পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্তদা, বিষয়টাকে আমি ঐভাবে দেখছি, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছিলাম, দায়িত্ব ছিল নজর রাখার, মেয়েটি কে আপনাদের সঙ্গে ছিল?

আমাদের মেয়ে। সুশান্ত বলেছিল।

আপনাদের মেয়ে ছিল বলে জানি না তো।

সুশান্ত তার ধৈর্য হারায়, তুমি কী বলতে চাও খুলে বলো দেখি।

অনিমেষ বলে, যাকেই রাখবেন বাড়িতে থানায় একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখবেন, পুলিশ কি মাইকিং করে বলেনি?

সুশান্ত বিরক্ত হলো, তোমার আর কিছু বলার আছে?

অনিমেষ বলল, কাজের মেয়েকে নিয়ে মিছিলে যাবেন ভেবেছিলেন সুশান্তদা, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলেছেন, ভালো করেছেন, আমি লিখছি আপনি এই হঠকারি মিছিলের পক্ষে নেই, গণ আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন আপনি, জরুরি অবস্থায় জেল খেটেছেন, বামফ্রন্ট আপনাকে মুক্তি দিয়েছিল, আপনার সব মনে আছে নিশ্চয়।

সুশান্ত বলল, আমি এই মিছিলের পক্ষে, আমার মেয়ে হাঁটতে পারবে না অতটা তাই যাইনি, আর বই কেনার ছিল।

আপনার মেয়ে! অনিমেষ অবাক, কী যা তা বলছেন, আপনার মেয়ে কোথা থেকে এলো?

হ্যাঁ, আমাদের মেয়ে, আমরা ওকে পালন করছি। সুশান্ত জোর গলায় বলেছিল।

আমি জানি সুশান্তদা, বহ্নিদি বলেছে সব ইস্কুলে, ওই ইস্কুলে আমাদের পার্টির চন্দ্রিমা কাজ করে, সে আমাদের পত্রিকায় লেখে, খবর সে দিয়েছে, মথুরগঞ্জ থেকে এনেছেন? নির্লিপ্ত গলায় কথাটা বলেছিল অনিমেষ।

সুশান্ত বলল, হ্যাঁ।

আমরা মথুরগঞ্জে খোঁজ নিয়েছি সব, ওর মা-বাবার নাম...।

সুশান্ত খুব ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কী বলতে চাও?

আপনারা কি মেয়েটাকে পাকাপাকি নিয়ে এলেন?

সুশান্ত বলল, তোমার খোঁজ নেওয়ার উদ্দেশ্য?

অনিমেষ বলল, আপনি ওকে মিছিলে হাঁটাবেন না, ওদের ফ্যামিলি আমাদের পার্টির সমর্থক, আর আপনিও তাই করলে ভালো, প্রতিক্রিয়াশক্তি ভয়ানকভাবে মাথা তুলছে।

সুশান্ত বলল, আর কিছু বলবে?

সুশান্তদা, আপনারা এমন সিদ্ধান্তই নেবেন যা সরকারকে সাহায্য করতে পারে, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, মেয়েটাকে কি কিনে এনেছেন সুশান্তদা? অনিমেষ কেটে কেটে বলেছিল।

সুশান্ত লাইন কেটে দিলো। বহ্নিশিখা আর লতা সামনে ছিল না বলে

ঘটনাটি তার কাছেই রয়ে গেল। কিন্তু সে মনে মনে বিব্রত হলো। কী অদ্ভুত কথা বানিয়েছে ওরা! কিনে এনেছে? মানুষ কেনা বেচা! কী ভয়ানক! এমন মন গড়া গল্প যদি রটে যায় লতাকে তো রাখাই যাবে না নিজেদের কাছে। সে ভিতরের ঘরে গিয়ে বহ্নিশিখাকে জিজ্ঞেস করল, চন্দ্রিমা কে?

বহ্নিশিখা আর লতা বই দেখছে। পাঠ্যপুস্তক এবং সুকুমার রায়। লতা আবোল তাবোল বুকে চেপে আছে, বলছে, আমাদের সার বলত এই কবিতা, শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো / আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ...হি হি, আমার মুখস্থ।

বহ্নিশিখা বলল, কলিগ, ওকে পড়াতে হয় না, চন্দ্রিমা টিচার নয়, আমি আর নন্দিতাদি পড়াই।

ও কী করে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছে।

ক্লার্কের কাজ।

তাকে বলেছ লতার কথা? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

হু, সবাই তো জানে, আমাদের ইস্কুলে ক্লাস ফাইবে ভর্তি হোক, ওকে আমি তৈরি করে নেব। বহ্নিশিখা বলল।

না, অন্য ইস্কুল দেখতে হবে, তোমার ইস্কুল না। সুশান্ত বলেছিল।

বহ্নিশিখা অবাক। তখন কোনো কথা হলো না আর। মেয়ের সামনে কথা হবে না। কিন্তু রাতে সব শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা দপদপ করতে লাগল, বলল, খুব ভুল করেছি মিছিলে না নেমে, অনিমেষ ভাবছে আমরা ভয় পাই, আমি আমার ইস্কুলে এই সিজনটা পড়িয়ে নির্ঝরিণী কন্যা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেবো, তুমি কি ভয় পাচ্ছ কমরেড?

ভয়ের কী আছে বহ্নি, কিন্তু বিপক্ষে গেলেই লতাকে রাখতে দেবে না কাছে। অনিমেষ সব জানে, শিশু শ্রমিক আইনে ফেলে দেবে।

যা করে করুক, আমরাও দেখি কী করতে পারে ও, অনিমেষ কী জানে, আমরা কি চুরি করে এনেছি? বহ্নিশিখা উত্তেজিত গলায় বলল।

রটিয়ে দেবে আমরা কিনে এনেছি, রাখতে দেবে না, কিন্তু আমরা রাখব ওকে এবং পরের মিছিলে যাবই। সুশান্ত গলা তুলে ডাকল, এই লতা, বহ্নিলতা?

লতা ছুটে এলো বই হাতে। বহ্নিকে জড়িয়ে ধরে, কী হয়েছে মা?

সুশান্ত তাকে জিজ্ঞেস করে, মিছিলে যাবি?

যাব, মিছিল বললেই সেই বিরামপুর থেকে মরিচঝাঁপি, কঠিন দেশ থেকে নরম দেশ, নিজির দেশে মিছিল করে আসা! মিছিল করে টিশন, টিশন থেকে মিছিল করে শ্যালদা...।

মরিচঝাঁপি, তুই জানিস? সুশান্ত তার হাত ধরে নিথর হয়ে গেল প্রায়। চল্লিশ বছর আগের কথা বলছে বছর বারোর মেয়ে। সে চাপা গলায় বুঝি উচ্চারণ করে, কমরেড কিছুই ভোলনি তুমি, অযোদ্ধা পাহাড়ের ফুলমনি বেসরা, বুড়ি ফুলমনি আর মথুরগঞ্জের যমুনারানি মৃধা, কেউ তোমাকেও ভোলেনি! জানালা দিয়ে বাতাসের ঝাপটা এলো। বাতাস তেতে গিয়েছে আবার।

মেয়ে বলল, জানি জানি খুব জানি।

কী জানিস তুই বল দেখি। বহ্নিশিখা বলল।

গুনগুন করল বহ্নিলতা,

শোনো মা শোনো,
দিনের বেলায় চুপচাপ
রাতের বেলায় চলল।
কার কথা গো কার কথা
যমুনাবুড়ি বলল?
মানা ভাটা বিরামপুরা
চলল দেশে ফেরা
বনের পাহাড় বনের গাছ
সাক্ষী দেবে তারা।

ছয়.

অতনুর সঙ্গে সুশান্তর দেখা হয়েছিল শিয়ালদায়, কত শীত বসন্তের পর গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়। লতা তখন ক্লাস ইলেভেন। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিল। সুশান্ত বেলঘরিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল অতনুকে। অতনু রিটায়ার করেছে। সরকারি চাকরি করত। প্রমোশনে প্রমোশনে অনেকটা উপরে উঠেছিল। রিটায়ারের পর আবার ঢুকেছে। রি-এমপ্লয়মেন্ট এখন খুব হয়। অশক্ত হয়ে না পড়লে অবসর নেই সরকারি চাকরি থেকে। অতনু ফ্ল্যাট কিনেছে দমদম থেকে একটু পিছিয়ে এসে পাইকপাড়া উমাকান্ত সেন লেনে। খুব বড় তার এরিয়া। তিনটি ঘর, বড় লিভিং স্পেস, তিন টয়লেট, নিচে গ্যারেজ। তার লাল মারুতি গাড়ি সেখানে ঝিমোয় আরো অনেক গাড়ির সঙ্গে। কিনেছিল কিন্তু ব্যবহার করা হয় কম। সেই হাউজিঙে সব ফ্ল্যাট মালিকেরই গাড়ি আছে। সব গাড়িই প্রায় ঘুমোয়। ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন, অধিকাংশের বয়স ষাটের ওপর। বলা যায় বয়স্কদের আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা বিদেশে কিংবা স্বদেশের অন্য রাজ্যে। বছরে কিংবা দুবছরে একবার আসে ক'দিনের জন্য। অতনুর একটিই মেয়ে। বিবাহের পর অদ্রিজা আমেরিকা মহাদেশের শারলট সিটিতে থাকে। উত্তর ক্যারোলাইনা রাজ্য। ঝাড়া হাত-পা যাকে বলে, অতনু তাই। কিন্তু এখন টের পায় ঝাড়া হাত-পা হয়ে সুখের চেয়ে অস্বস্তি বেশি। সে অফিস করছে, তার বউ কুন্তলা সমস্তদিন বাড়িতে একা। ইস! আর একজন কেউ যদি থাকত, কিছু একটা করার থাকত। মেয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার পর জীবন খুব শ্লথ হয়ে গেছে। তারা তিনমাস ঘুরে এসেছে সেই দূর পশ্চিমের অতুল বৈভবের পৃথিবী থেকে। গ্রান্ড ক্যানিয়ন, নায়াগ্রা, লং ড্রাইভ, মনুষ্যবিরল হাইওয়ে, মিসিসিপি নদী, ১৪ ঘণ্টা টানা উড়ানে অতলান্ত মহাসাগর পার হয়ে যেন নিঃস্ব হয়ে ফিরেছে। পাঁচদিন ঘরে বসা, দুদিন ঘরের বাইরে যাওয়া। অতনুর সাধ মিটেছে। অনেকদিন বাদে সে আবার লিখতে চেষ্টা করছে গোপনে। কিন্তু হচ্ছে না। কী করে হবে? এই অদ্ভুত নীরক্ত সফলতার কি কোনো কাহিনি হয়? গল্প হয়? কুন্তলা ফেসবুক করে। মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মেসেজে। এক একদিন ভিডিয়ো চ্যাট হয় মেসেঞ্জারে। হোয়াটস অ্যাপে ভিডিয়ো কল। ইদানীং অতনুর মনে হয় ফুরায়েছে জীবনের সব লেনদেন। অফিসে যাচ্ছে, কিন্তু অফিস ভালো লাগে না। মনে হচ্ছে ছেড়ে দেয়। টাকার আর দরকার নেই। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে কুন্তলার সঙ্গে টিভি ধারাবাহিক দ্যাখে। খবর শোনে। বিরক্তিকর ক্রিকেট দেখতে দেখতে ঝিমোয়। সকালে হাঁটতে বেরোয়। সঙ্গীরা সবাই কত অখুশি, বাইরে বেরিয়েই শুধু নিন্দা করে নিকটজনের। ঠিক এই সময় দেখা স্টেশনে সুশান্তর সঙ্গে। দুহাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিল সে, 'অতনু না, তুই অতনু? আমি ঠিক চিনেছি।

অতনু জিজ্ঞেস করে, আপনি, মানে তুমি?

আমি সুশান্ত, ভুলে গেলি, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কেমিস্ট্রি, "সংক্রান্তি"।

এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার...

মনে পড়তে লাগল। ভেসে এলো বুঝি নব জীবনের সেই গান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অতনু বোস। সেই অতনু? বেলগাছিয়ার অতনু? গ্রামে যাওয়ার আগে যার সঙ্গে সারা দুপুর সেই পার্কে। সুশান্ত দৃপ্ত গলায় বোঝাচ্ছে, 'অতনু অতনু, তুই লিখতে চাস তো দুঃখ-দারিদ্র্যে ভরা ভারত দেশটিকে দেখতে হবে। মাটি আর মানুষ। তুই আমার সঙ্গে গ্রামে চল।'

অতনু বলেছিল, আমার বাবা রিটায়ার করেছেন, আমাকে উপার্জনের জন্য বেরতে হবে, আমার বোন রয়েছে, ভাই রয়েছে, দাদা তেমন কিছু করে না, আমি পারব না।

আমি কী করে পারছি অতনু, দেশের ভুখা মানুষ আমাদের দিকে চেয়ে আছে, সত্তর দশক মুক্তির দশক হবে, তোকে একটা বিপ্লবের গান লিখতে হবে, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত' লিখতে হবে।

মনে পড়ে, সব মনে পড়ে। ভেসে আসে প্রাচীন বাতাস। গলা বুঁজে যায় অতনুর, কাঁপতে থাকে, বিড়বিড় করে, সুশান্ত তুইইই ভালো আছিস? কেমন আছিস সুশান্ত? কতজনের কাছে খোঁজ করেছি। কেউ বলতে পারেনি, আমি তো ভেবেছিলাম...।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, মরে গেছে সুশান্ত, নারে, পারেনি মারতে, বেঁচে ফিরে এসেছিলাম, আবার আরম্ভ করেছি জীবন, তুই ভালো আছিস? •

চলবে...

সাক্ষাৎকার

বাঙালির পরিমণ্ডল বিস্তৃত হবে

পবিত্র সরকার

পবিত্র সরকারের জন্ম ২৮ মার্চ ১৯৩৭, ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার সাভারের বলিয়ারপুর। দেশভাগের বছরেই কলকাতায় যান। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে শিকাগো যান গবেষণা করতে। গবেষণাশেষে মিনেসোটায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং পদোন্নতির পর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ হতে সাত বছর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। পরবর্তীতে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন তথা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি হন। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এই ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিত, সাহিত্যিক, নাট্যসমালোচক ও শিক্ষাবিদ ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কার, জাতীয় সংহতির জন্য ইন্দিরা গান্ধী অ্যাওয়ার্ড ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন লাভ করেন। এছাড়াও ২০১৯-এ জাপানের তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য রাইজিং সান', 'গোল্ড অ্যান্ড সিলভার রেজ' প্রাপ্ত হন। ৭ অক্টোবর ২০২৩-এ ঢাকার একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন কবি **রাহেল রাজিব**

আপনার জন্ম অধুনা বাংলাদেশে, শৈশব-কৈশোর ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববাংলায়। আপনার শৈশবের গল্প শুনতে চাই।

বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বলিয়ারপুর গ্রামে আমার জন্ম। জন্মের তিনমাস পর আমাকে অন্য একটি পরিবার দত্তক নেয়। সেই পরিবারেই বেড়ে উঠি। দত্তক নেওয়া পরিবারটির বাড়ি সাভারের আরেকটু উত্তরে নয়াহাটের দিকে, তখন নাম ছিল ঠাকুরপঞ্চাশ। এটা ধামরাইয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেই গ্রামে আমার পাঠশালা এবং ধামরাই হার্ডিঞ্জ স্কুলে আমি বছর দেড়েক পড়ি ক্লাস থ্রি এবং ফোরের হাফ ইয়ারলি পর্যন্ত। ঠাকুর পঞ্চাশ গ্রামে বসবাস করছি, ধামরাই স্কুলে পড়ছি, তখন চারপাশে আলোচনা– এবার হবে দেশভাগ, ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তিনখণ্ডে আমার একটি আত্মজীবনী বই আছে 'অল্প পুঁজির জীবন', তাতে আমি এসব লিখেছি। তবুও একটু পুনরাবৃত্তি করে বলি যে আমার গ্রামটা ছিলো হিন্দুপ্রধান। পাশের গ্রাম ইসলামপুর অর্থাৎ পুরোপুরি মুসলমানদের। যদিও দুই গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের উত্তাল সময়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছে–আমার মনে হয় মুসলমানরা কয়েকশ বছর পূর্বে ভারতবর্ষে আসার পর জনতাস্তরে একটা বোঝা পড়া হয়, একসঙ্গে বাস করার ইচ্ছে ছিলো। তার প্রমাণ আমার জীবনে খানিকটা আছে; সেটা হলো, একটা প্রথা ছিল একটা হিন্দু বালকের সঙ্গে মুসলমান বালকের দোস্তালি পাতানো। আমার ক্ষেত্রে মুসলমান গ্রামটি অর্থাৎ ইসলামপুর গ্রামের মোড়ল কুটুলি ব্যাপারীর ছেলে আবদুর রহমানের সাথে দোস্তালি পাতানো হয়েছিল। আমার সে বন্ধু এখনো আছে। আমি এখানে এলে সুযোগ পেলে তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

দেশভাগ বাংলা অঞ্চলে একটি গভীর দাগ কেটে ফেলেছে এ ভূখণ্ডের মানুষের জনজীবনে। আপনার জীবনে দেশভাগের প্রভাব কেমন পড়েছে?

দেশভাগও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াতে লাগল, এই উত্তেজনার প্রেক্ষিতে আমার একটা গল্প আছে। সেই গল্পটা আমি বলেছি নানা জায়গায়। একজন মৌলবি সাহেব বাংলা পড়াতেন। তিনি খুলনার মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দেখতে। মাথায় ফেজ টুপি। উনি আমাকে স্নেহ করতেন। যেহেতু আমার বাবা জমিদারের ছোটনায়েব ছিলেন। তিনি আমাকে সরকার মশায় বলতেন। একবার তিনি ছুটিতে যাওয়ার আগে একদিন ক্লাসে বললেন, আমি তো ছুটিতে আমার দেশে যাব। সরকার মশায়, তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি? তখন আমি একদম কিচ্ছু খেয়াল না করে বলি,–না, মৌলবিসাব আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনার সঙ্গে গেলে মুসলমানরা আমাকে কেটে ফেলবে। এই কথাটা বলার পর মৌলবিসাব একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন! চোখ দুটো বড় বড় হয়ে এলো! এবং বললেন, তুই আমাকে এত বড় একটা কথা বললি! আমার সঙ্গে গেলে মুসলমানরা তোকে কেটে ফেলবে! তার চোখে জল এসে গেল। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। উনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হায় আল্লাহ! দেশটাকে তুমি কী করে ফেললে! দেশভাগ আমাদের এমন ঘটনার সম্মুখীন করেছে। তখন ছোট পিসিমা ও আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সম্ভবত ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের নয় তারিখ চলে গেলাম ঢাকার মেরুল হয়ে শিয়ালদহে। তখন আমার ১১ বছর বয়স।

আপনার স্কুল-কলেজ পাঠের খবরাখবর শুনতে চাই

পশ্চিমবাংলায় এসে আমরা গেলাম খড়গপুর নামে একটি রেলওয়ে শহরে। ওই শহরে আমি বড় হতে লাগলাম। একটা বাস্তু স্কুল তৈরি হলো। সেখানে আমি পড়তে লাগলাম। তখনকার দিনে এসএসসি বা মাধ্যমিক বলত না, বলত স্কুল ফাইনাল। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। সামান্যর জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম না। তারপর খড়গপুর কলেজে ভর্তি হলাম। ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম। আমার সম্পর্কিত এক দিদি বললেন, আইএস হতে হবে, সিভিলিয়ান হতে হবে। আমাকে ভর্তি করে দিলো কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। ওখানে পড়ার মতো আমাদের সে সম্বল ছিল না, কিন্তু ভর্তি হলাম। এক বছর পড়ার পর আমার আর ভালো লাগল না। বলা যায় অন্যের সিদ্ধান্তে আমার জীবন তৈরি হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, ইকোনোমিক্স ছেড়ে বঙ্গবাসী কলেজে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হলাম।

বঙ্গবাসী কলেজের কথা মনে পড়লে বিস্ময় লাগে, কেননা যে কলেজে আমি পড়েছি সেই কলেজে পড়াব তা হিসেবের মধ্যে ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে গেলাম। বিএতে ফার্স্ট ক্লাস হয়নি কিন্তু ফার্স্ট ছিলাম, ৭ নম্বর কম ছিল। এখান থেকে আমার জীবনটা বদলে যেতে শুরু করল। তখন একটা বৃত্তি পেয়ে গেলাম এবং মাস্টারমশায়দের নজর পড়ল আমার ওপর। বিখ্যাত সব মাস্টারমশায়–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পেশায় একজন শিক্ষক হবেন, এটা কখন মনে হলো?

এমএ-এর ফলাফল আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে দিলো। মূলত আমি যে শিক্ষক হব এবং বাংলার শিক্ষক সেটার ভিত্তিটাও তৈরি হয়ে গেল। আমি আমার কলেজ বঙ্গবাসীতে কিছুদিন পড়ালাম। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি দেখে দরখাস্ত করি। ১৯৬২ সালে ফল বের হলো, বঙ্গবাসী কলেজে গেলাম ১৯৬৩ সালে, সেই বছরই আগস্টে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম।

ভাষাবিজ্ঞান পড়তে যাওয়ার গল্পটা...

যাদবপুরে ছয় বছরের মতো কাজ করার পর ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেলাম। যাকে বলে পিএইচডি প্রোগ্রাম। সেখানে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে এমএ ও পিএইচডি করলাম। পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শিকাগোর ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষক, তিনি ভারতের মুন্ডারী ভাষার গবেষক। ডিগ্রি শেষে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর পড়ালাম। সেখানে প্রথম কন্যার জন্ম হলো। স্ত্রী ও কন্যাসহ দুইবছর পর ফিরে এলাম যাদবপুর। পড়ানো শুরু করলাম। সামান্য সমস্যা হয়েছিল, তখন চাকরি ছিল না। যাদবপুর পড়াতে পড়াতে বইপত্র লেখা শুরু হলো।

শিক্ষকতার সমান্তরালে প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলেছেন দারুণভাবে–আপাদমস্তক একজন নিপাট অধ্যাপকও যে শিক্ষাপ্রশাসনে এতটা নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে প্রশাসন চালাতে পারেন, সেটি এখন তো প্রায় বিরল। সে অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।

১৯৯০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দেই। সেখানে ৭ বছর ছিলাম, ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান (পশ্চিমবঙ্গের ইউজিসির মতো) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদ। উচ্চশিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি বানানো হয় আমাকে, শিক্ষামন্ত্রী সভাপতি। সেখান থেকে ২০০৩ সালে আমি অবসরে যাই। এ হচ্ছে আমার শিক্ষা ও কর্মজীবনের বৃত্তান্ত। দায়িত্ব পেয়েছিলাম, পালন করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে।

পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু কথা...

১৯৭৩ সালে প্রথম কন্যাসন্তান হয়, তার ছয় বছর পর দ্বিতীয় কন্যাসন্তান। ওরা ভারতেই থাকে, প্রথম কন্যাসন্তান একটি সরকারি আলীপুর মাল্টিপার্পাস গভর্মেন্ট গার্লস স্কুলে পরিসংখ্যান বিষয়ে পড়ায়। দ্বিতীয় কন্যার বিষয়টি একটু বিচিত্র! সে হায়দ্রাবাদে ভাষাবিজ্ঞানে এমএ, এমফিল, পিএইচডি করেছে। তার স্বামী জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে আছে। তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে থেকে শ্বশুর ও ছেলেসন্তানকে দেখাশোনা করতে হয়। এখন সে চুচুড়ায় থাকে।

প্রবাসে গেলে মানুষ সাধারণত ফেরে না, আপনি তো মার্কিন মুলুকে পড়তে গেলেন এবং পড়াচ্ছিলেনও–কন্যার জন্মও ওখানে। ফিরে এলেন কেন? কোটি মানুষের স্বপ্ন যে দেশে স্থায়ী হবার, সেখানে আপনি কেন স্থায়ী হলেন না?

আমার জীবনে তেমন কোনো বড় ঘটনা না। এটা আমি ধরে নেই অনেক মানুষের মতো করে। লেখাপড়া জানা মানুষেরা নয় শুধু, গরিব মানুষেরা দুবাই, মধ্য-প্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে যায়। অনেক বাঙালির জীবনে ঘটে। অনেকেই বিদেশে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি যেটা করেছিলাম বিদেশে যাব কিন্তু থাকব না। আমার স্ত্রীও সেটা মেনে নিয়েছিল।

ভারত ও বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার খবরাখবর সম্পর্কে শুনতে চাই।

এই মুহূর্তের পুরো খবর আমি জানি না। তবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক হাকিম আরিফ একদম ক্লিনিক্যাল লিংগুস্টিক। থিওরিক্যাল লিংগুস্টিক নিয়ে নতুন কোনো ছেলেমেয়ে কাজ করছে কিনা সত্যি সত্যি জানি না। এমনও হতে পারে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি তাদের সাথে। ড. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে তেমন জানি না। বাংলা ভাষার বিশেষ করে উপভাষাগুলোর বিচার বিশ্লেষণ অনেক, এটা অনেকটা প্রথাগত তত্ত্বের মতো প্রচলিত। নতুন যেসব তত্ত্ব পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত হচ্ছে নোয়াম চমস্কি তত্ত্বের পরও সেভাবে কি ধরনের গবেষণা হচ্ছে–আমি সত্যিকার অর্থে জানি না। শিশিরকুমার ভট্টাচার্য্য খানিকটা চমস্কি তত্ত্ব শুরু করেছিল, তার কোনো শিক্ষার্থী এখনো পড়ছে কিনা জানি না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের জন্যে কোনো পরামর্শ যদি দেন...

এটা তো সমালোচনার মতো শোনাবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে A knows little English who knows English only অর্থাৎ যে শুধু ইংরেজি জানে সেও পুরোপুরি ইংরেজি জানে না। এটি সব বিদ্যা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আমরা যখন বাংলা পড়ব এমএ, বিএ, পিএইচডি করব তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে যে শুধু বাংলা পড়লে চলবে না, বাংলার সঙ্গে সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন পড়তে হবে। তারপরও শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে হলে বিজ্ঞান কি, বিজ্ঞানের কাজ কি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের কাজ কি আমাদের জীবনে তা জানতে হবে। একটা পর্যায়ে জ্ঞান অনন্ত হয়ে যায়। বাংলা পড়ছি বলে অন্য কিছু জানব না, এমনটা হবে না–অন্তত আরেকটা ভাষা সম্পর্কে জানা উচিত। যেমন ইংরেজি। একাধিক ভাষা জানা ও শেখা যায়।

একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও আপনার সুনাম রয়েছে–দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দেখছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ শুনতে চাই।

উদ্যমী একটা সাংস্কৃতিক চর্চা বিশেষ করে বাঙালির জেগে ওঠার পর্বে আত্মসংঘাতটা আমি দেখেছি ব্যাকুলভাবে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব ছিল, কেউ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগ করেছে এবং নব্য ঐতিহ্যিক ত্যাগ পাশে সরিয়ে হাজার বছরের যে বাঙালি সংস্কৃতি সেটাতে নানা ধরনের মাত্রা যুক্ত করতে চেয়েছে। সেধারা থেকে ভাষা আন্দোলন। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও পশ্চিমবাংলার সাহিত্য একাডেমিক সিলেবাসে আলাদা করে পাঠ্য প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল–এ পার্থক্য কি সার্বিকভাবে চোখে পড়ে?

এমনিতে আলাদা করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যে এই সময় পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনটা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে–সেটি আমরা দেখি এবং ভালো ব্যাপার। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক জীবন ও মধ্যবিত্ত জীবনটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে–তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদাহরণ।

সাহিত্যে তত্ত্ব নাকি তত্ত্বের সাহিত্য? এ বিতর্ক বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য হয়ে ওঠে–বাংলা সাহিত্যে এর প্রতিফলন কেমন?

তত্ত্বের কথা বলতে গেলে ধ্রুপদিবাদের নাম ওঠে। আমরা জানি নতুন একটা তত্ত্ব পুরোনোকে মুছে দিয়ে যায়, যাকে বলা যায় বাস্তববাদ। বাস্তববাদকে ভাংচুর করে দাদাবাদ-অস্তিত্ববাদ এসেছে। এ সমস্ত কাঠামোকে আবার ভেঙে দিয়ে পোস্ট মর্ডানিজমকে দেখতে পাই। বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালির যত বিস্তার হবে, বাঙালির পরিমণ্ডলও তত বিস্তৃত হবে।

অনেকে আবার স্মৃতিমূলক সাহিত্য লিখে, যেমন অনেকে থাকে নিউইয়র্কে–কিন্তু বাংলাদেশের জীবন-জীবনী নিয়ে লেখালিখি করে। আশা করি তার পরিমণ্ডলটাও আসবে যেখানে সে বাস করে। আমার বন্ধু হুমায়ূন কবির থাকে টেনিসে, তার সাহিত্যে টেনিসের কাহিনি আসবে। diaspora literature যত চলবে বহুবিস্তৃতভাবে তত বাংলা ভাষায় লিখা হবে। বাঙালির একটা তথা যেকোনো জাতির একটা মৌলিক ভাষার ভাইব্রেন্ট থাকে। শতাব্দীর ৭০ বছর থেকে ক্রমশ বিস্তার হচ্ছে ভাষা। ইংরেজিতে একে মেইনটেইনেন্স বলে। এ মেইনটেইনেন্স ও লুজ– এদুটি গতিতে ভাষার যাতায়াত করে। কতটা রাখব কতটা ছাড়ব। সন্তানরা স্কুলে যায় অন্য ভাষা শিখতে হয়। এটার জন্য আমি দেখেছি আমার ছাত্রী নিউইয়র্কে শনি রোববার করে বাংলা শেখায়। সেখানে অনেক স্কুল হয়েছে, বইও লিখেছে কানাডিয়ান প্রবাসীরা। মূলত একটা গোষ্ঠী হিসেবে থাকলে জোর পায়, বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে সেখানে ভাষা রক্ষা করা কঠিন। এখন বাঙালি বিশ্বের নানা প্রান্তে যাচ্ছে এবং গোষ্ঠী হিসেবে সংঘবদ্ধ হচ্ছে নিউইয়র্ক, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপে। ওখানে তারা ভাষা চর্চায় বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে আপনি দারুণ ভূমিকা রেখেছেন–এটা নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে একটা যৌথ কাজ হবার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতার বাংলা আকাদেমি শেষ পর্যন্ত পারল না সরকার বদল হওয়ার কারণে। আমার বিষয়ে রফিকুল ইসলাম শামসুজ্জামান ভাইকে বলেন, ওকে নিয়ে এসো। এর ফলে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে নিলেন এবং ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত আমি ঢাকায় অন্তত বছরে চারবার ১৫-২১ দিন করে থেকে ওয়ার্কশপ মোড করে সবাইকে নিয়ে লিখিয়ে ব্যাকরণের দুই খণ্ড খসড়া তৈরি করলাম। এটার একটা ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষার নিজস্ব সংগঠন যেটাকে প্রমিত বাংলা বলা হয় এর পাশাপাশি সংস্কৃতের সাথে বাংলার প্রভাব, অপরটি বাংলার সঙ্গে আরবি-ফারসির প্রভাব এগুলো নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড হলো। মূল সংগঠন নিয়ে প্রথম খণ্ড হলো। স্কুলের জন্য ব্যাবহারিক বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করেছিলাম। এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। বাংলা একাডেমিতে বসে মহাপরিচালকের ঘরে–তিনি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিতেন। গল্পে, কাজে, আড্ডায় প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে কখনো কখনো রাত ৮টা হয়ে যেত। একটি ছেলে আল আমিন সে কম্পিউটার নিয়ে বসত, কাজ শেষে সে বলল ১২০০ পৃষ্ঠার কাজ করলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। খাওয়া দাওয়ায় রোমানা ও সায়রা নামের দুটি মেয়ে আমাদের সহায়তা করত তারা এখন আমার মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে। রফিক ভাই চমৎকার গল্প বলতেন এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীগণ মাঝেমধ্যে এসে গল্প করতেন। রামেন্দু মজুমদার, আসাদ চৌধুরী এঁরা পানের বটোয়া খুলে পান খাওয়াতেন। তারপর সৈয়দ শামসুল হকের কাণ্ডটা অদ্ভুত। তিনি তার একটা কবিতার বই *দগ্ধ দেহের চাঁদের নবনী* ড. রফিকুল ইসলাম ও আমার নামে অর্থাৎ আমাদের দুই সম্পাদকের নামে উৎসর্গ করে দিলেন। এই সাংস্কৃতিক ঘটনাগুলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

বানান নিয়ে নানান বিভ্রাট প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়–এ বানান জটিলতার উত্তরণের পথ কোথায়?

এটা স্কুলের ব্যাকরণেই শেখানো হয়। বাংলা ভাষার শব্দগুলো কোন কোন জায়গা থেকে এসেছে ঋণ বা বির্বতনের মধ্য দিয়ে, বিবর্তিত শব্দগুলোর বানান স্বাধীনতা নেই। ঈ,ঊ,ঔ থাকবে না, ণ থাকবে না–এই মূলনীতি কয়েকটি কিন্তু তৎসম শব্দ যেগুলো সেগুলোতে রাখতে হবে। তৎসম মানে সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত বানানে আছে ওগুলো ছাড়া অন্য বিদেশি শব্দে স্বাধীনতা কমবেশি। যেমন ঈদ>ইদ নিয়ে সমস্যা হয়। ঈদ নীতি অনুযায়ী ইদ লিখার কথা কিন্তু বাঙালির জিবে দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, দীর্ঘ উচ্চারণ মানে phoneme হিসেবে মূলধ্বনি উচ্চারণ। ইদ ও ইসলামে ই কার হলেও ধর্মকে নিয়ে মানুষের একটা আবেগ রয়েছে। যার কারণে আরবিতে দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল। তার জন্য কখনো কখনো বিকল্প রাখতে হয়।

নয়তো বাংলা একাডেমির যে একটা বড় অভিধান আছে তাতে এসবের সমাধান রয়েছে। মূল লক্ষ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষা শিখছে, তাদের জন্য যদি একটা শব্দের বানান করে দিতে পারি তাহলে ওদের উপকার হয়। বড়রা কি করছে সেটা বিষয় না, বড়রা খেলা করতে পারে। কিন্তু ছোটরা শিখবে; তাদের মাতৃভাষা তাদের জন্য কাজটা সহজ করে মৌলিক জায়গাটা রাখা উচিত। আমি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমিকে দিয়ে লিপির সংস্কার করিয়েছি। আমার প্রস্তাব থেকে গো>গু, শো>শু থাকবে, যুক্তব্যঞ্জন অনেক সহজ করেছি ক এর নিচে আস্ত ব্যাঞ্জন ত থাকবে ক+ত, ঙ্গ না হয়ে ঙ+গ মানে বানানের স্পষ্টতা থাকবে যেন সহজে বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ এর হ+ম বোঝা যাবে নতুন টাইপোগ্রাফি হয়েছে। সুন্দরের ব্যাপারটা একেকজনের কাছে একেকরকম। কারোর কাছে আমারটা পছন্দ না হলে বাঁধা দিতে এক পায়ে খাড়া থাকে এটা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ঞ্জ, জ্ঞ কে বদলাতে পারিনি–কারণ এর উচ্চারণ বদলে গিয়েছে।

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষার দেশ–আপনার নাড়িমাটি। নাড়িমাটির আবেগ বারবার টানে আপনাকে, এটা নিয়ে বলুন।

আমার তো জন্মভূমি বাংলাদেশ। জন্মভূমি কখনো বদলায় না। আমি কবে মারা যাব জানি না। কিন্তু জন্মভূমিটা থেকে যাবে। ফলে আমার একটা আবেগ আছে। আমার বড় মেয়ে বলল, তোমার জন্মস্থান দেখতে চাই। গত ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে গিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ছিল কিন্তু ভাষার জন্য একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন দৃষ্টান্ত। সব মিলিয়ে একটা ভীষণ আবেগ কাজ করে। বাংলাদেশ থেকে ডাক পেলে এই ৮৭ বছর বয়সেও চলে আসি! ছুটে বেড়াই। মেয়েরা বলে তুমি যদি পার যাও। সেই মনের জোর থেকে জুন মাসে নিউইয়র্কে গিয়েছি। চেষ্টা করি বাংলাদেশ ডাকলে সকলের আগে সাড়া দিতে।

শরৎ-শারদীয়। শরৎ মানেই উৎসব আনন্দবার্তা। বাঙালির জীবনে উৎসবের রং নিয়ে আসে শরৎ। আপনার শরৎ ও শারদীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে শুনতে চাই।

আমি তো ঢাকার গ্রামের শরতে জন্মাই। সেই শরতে কাটে আমার শৈশবের প্রায় ১০-১১ বছর। তখনকার মাঠ, পুকুর, শাপলা ফুল, পানিভর্তি নদীর স্মৃতি আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে আছে। শরৎকালে দুর্গাপুজা হতো এবং এটিই আমাদের গ্রামে একমাত্র পূজা ছিল। কিন্তু যেটা আনন্দের ব্যাপার ছিল জামাকাপড়, জুতো ইত্যাদি কেনা এমনকি পড়াশোনা ক'দিনের জন্য বন্ধ থাকা। এছাড়াও দূর দূর থেকে আমাদের গ্রামে মানুষেরা যারা কলকাতা বা ঢাকায় থাকতেন তারা নৌকো করে ফিরে আসতেন। পুজার মধ্যে আমরা প্রতিদিন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতাম নৌকো ও মটর লঞ্চ দেখার জন্য। মটর লঞ্চ করে দূর শহরের মানুষেরা আসছে এবং তাদের গন্ধ, শহরের গন্ধ নিয়ে ছোট ছোট ভাইবোনগুলো আসত। তাদের গায়ে অন্যরকম গন্ধ থাকত। মিষ্টি, জামাকাপড়, পারফিউম, বইপত্র আসত আমাদের জন্য উপহার হয়ে। সেটা আমাদের জন্য মহা আনন্দের ব্যাপার ছিল এবং বাড়িতে মায়েরা আগে থেকে নারকেল কুড়িয়ে নানারকম খাবার যেমন তক্তি, নাড়ু, সন্দেশ তৈরি করতেন অনেক আগ থেকেই। বাড়িতে নারকেল থাকত সেগুলো কুড়নো হতো। মায়েদের রান্নাঘর থেকে গন্ধ বের হতো। চমৎকার সে গন্ধ। নাড়ু, তক্তি গোল গোল করে তৈরি করতাম। আমাদেরও কিছু জুটত। পরে কলকাতা বা শহরের যে পুজা দেখেছি–সে পুজার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না। হ্যাজাক লাইটে পূজা হতো। পূজার পর নদীর মধ্যে নৌকার ওপর প্রতিমা বসিয়ে সেগুলো বিসর্জন দেওয়া হতো। হ্যাজাকের আলোয় আমরা সেটা লক্ষ করতাম। পূজার পর নাটক হতো সে নাটকের রিহার্সাল আমাদের বাড়িতেই হতো এবং দেখতাম যারা বিশেষ করে মেয়েদের ভূমিকা করতেন, মেয়েদের মতো গলা করতে তাদের গলা বসে যেত। তখন মায়েরা-বৌদিরা আদা-চা করে তা সারানোর ব্যবস্থা করতেন।

অবাঞ্ছিত হাস্যরস হতো, নায়িকারা ফ্যাস-ফ্যাসে গলায় কথা বলছে, নাটকে খুব হাসাহাসি হতো কিন্তু বুড়োরা 'সাইলেন্ট (!) সাইলেন্ট (!)' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। আমার সেসব মনে আছে। গ্রামের মধ্যে অন্ধকারে ধানখেত দিয়ে অন্য গ্রামের মানুষেরা হারিকেন নিয়ে নাটক দেখতে আসত। হারিকেনের দোলাচল দেখে মনে হতো অন্ধকারও যেন দুলছে। এইভাবে গ্রামের পূজা কাটত। কেন জানি না শহরের পূজা সম্বন্ধে আমার আকর্ষণ কম এবং এর আগে যে মফস্বল শহরটায় থাকতাম–খড়গপুর, সেখানে একটা ব্যাপার ছিল বিজয়া দশমীর দিনে খড়গপুরের মাঠে সমস্ত প্রতিমাকে ট্রাকে করে নিয়ে আসা হতো, সারিবদ্ধ রাখা হতো। একটা প্রদর্শনীর মতো হয়ে যেত, প্রায় শ' খানেক প্রতিমা মাঠে রাখা হতো। এর পাশে আলো জ্বলছে যেন আলোর উৎসব। তারপর খানিকক্ষণ বাদে নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিত। আমরা কখনো কখনো ট্রাকের সাথে নাচতে নাচতে যেতাম। বিজয়া দশমীর মিষ্টি খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে যেত। তখন কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে লুচি, আলুর দম খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। এবং যথারীতি পেটের অবস্থা ভালো থাকত না।

কলকাতায় বড় হবার পর, এখনো মনে আছে, আগে পাহাড়ের থিমে মা দুর্গা বসে বসে আছেন–আর এখন অজস্ররকম থিম হচ্ছে–মাছের আঁশের মণ্ডপ, মাটির খড়ির মণ্ডপ। এখন আমার এসব ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। বয়সের কারণে কোথাও যেতে পারি না। তবে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে ভালো লাগে, বাড়ির পাশে একটি ঠাকুর হয় তাতে সারা রাত ধরে লাইন পড়ে যায় এবং লাইনের কথাবার্তা খুব মজার, লাইনের কথাবার্তা শুনি–ঐখানের বিরিয়ানিটা ভালো ছিল, ঐখানের মুরগির রোলটা ভালো ছিল–এসব। পূজা দেখে মানুষ ফিরে যায়। মানুষের উৎসাহ, ছেলেমেয়েদের উৎসাহ আছে এখনো–আমি সেসব জানালার ধারে বসে দেখি। বলা যায়, এখন আমি শরৎকালের উৎসব ঘরে বসে কাটাই।

সময় দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আপনি বারবার ফিরে আসুন এ নাড়িমাটিতে এবং যাপন করুন আপনার আশৈশব লালিত সময়...

ধন্যবাদ তোকেও। তোরাও ভালো থাকিস। ভালো পড়িস, ভালো লিখিস। •

ড. রাহেল রাজিব
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Tripura map

একনজরে ত্রিপুরা

দেশ	ভারত
অঞ্চল	উত্তর-পূর্ব ভারত
রাজধানী	আগরতলা
জেলা	৮টি
প্রতিষ্ঠা	২১ জানুয়ারি ১৯৭২
সরকার	
• রাজ্যপাল	শ্রী সত্যদেব নারায়ণ আর্য
• মুখ্যমন্ত্রী	অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা
• আইনসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (৬০টি আসন)
• লোকসভা	১৭
• হাইকোর্ট	ত্রিপুরা হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	১০,৪৯১.৬৯ বর্গকিমি
• এলাকা ক্রম	৩য় ক্ষুদ্রতম রাজ্য
জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
• মোট	৩৬,৭৩,৯১৭
• ক্রম	২২তম
• ঘনত্ব	৩০৫ জন প্রতি বর্গকিমি
• সাক্ষরতা	৮৭.৮%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় মান সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	৩১৬৬ IN-TR
সরকারি ভাষা	বাংলা, কোকবোরোক এবং ইংরেজি
ওয়েবসাইট	w.w.w.tripura.gov.in

শ্রী সত্যদেব নারায়ণ আর্য
রাজ্যপাল

অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

ত্রিপুরা

দেবলাল বিশ্বাস

পৌরাণিক মহারাজা ত্রিপুরের নামানুসারে ত্রিপুরা নামটির উদ্ভব। যযাতির বংশধর দ্রুহ্যের ৩৯তম উত্তরপুরুষ হলেন ত্রিপুর। অন্য এক ব্যাখ্যার সন্ধানও মেলে, ত্রিপুরা নামটির উৎস হলো হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত দশমহাবিদ্যার অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাছাড়া ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি রাজ্যের আদিবাসীদের অন্যতম ভাষা ককবরক থেকে এসেছে বলেও অনেকে মনে করেন

ভৌগোলিক অবস্থান

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। এর আন্তর্জাতিক সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৮৫৬ কিলোমিটার। রাজ্যটি ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে NH-44 দ্বারা সংযুক্ত যা আসাম, মেঘালয়, উত্তরবঙ্গ, কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্য দিয়ে চলে।

পর্যটন

ছোট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ত্রিপুরা পর্যটকদের জন্য চমৎকার প্রাসাদ (আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, কুঞ্জবন প্রাসাদ এবং নীরমহল–মেলাঘরের লেক প্যালেস), চমৎকার পাথর খোদাই এবং পাথরের ছবি (কৈলাশহরের কাছে উনাকোটি, উনকোটি) দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। বেলোনিয়া মহকুমার অমরপুর এবং পিলাকের কাছে দেবতামুরা), উদয়পুরের বিখ্যাত মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির (হিন্দু পুরাণ অনুসারে ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে একটি) সহ হিন্দু ও বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ মন্দির রয়েছে। এছাড়া রয়েছে গন্ডাচেরার ডুম্বুর হ্রদ নামের বিশাল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ। মহকুমা, মেলাঘরের রুদ্রসাগর, অমরসাগর, জগন্নাথ দিঘি, কল্যাণ সাগর, উদয়পুরে, মিজোরামের সীমান্তবর্তী জাম্পুই পাহাড়ের সুন্দর হিল স্টেশন, সেপাহিজলা, গুমতি, রোয়া এবং তৃষ্ণায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।

প্রাক্তন মহারাজারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রাসাদগুলো রাজ্যের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাষা

বহুজাতিগোষ্ঠীর ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস। এদের মধ্যে বাংলা, কোকবোরোক এবং ইংরেজি হচ্ছে সরকারি ভাষা। অন্যান্য ভাষার মধ্যে রয়েছে মগ, চাকমা, হালাম, গারো, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরি, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি।

বৃষ্টিপাত

জুন থেকে সেপ্টেম্বর হলো বর্ষাকাল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০০ মিমি। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ২৮৫৫ মিমি (কামালপুর)। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ১৮১১ মিমি (সোনামুরা)।

জনসংখ্যা

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য। জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তপশিলি উপজাতির অন্তর্গত। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, রাজ্যের জনসংখ্যা হলো ৩৬.৭৪ লাখ, যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫০ জন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাক্তন রাজ্য ত্রিপুরা মানিক্য রাজবংশের মহারাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। রাজমালা, ত্রিপুরার রাজকীয় কালানুক্রম অনুসারে, ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এক হওয়ার আগে মোট ১৮৪ জন রাজা রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ ত্রিপুরাকে 'সি' ক্যাটাগরির রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ১ নভেম্বর, ১৯৫৬-এ এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া পায়। ত্রিপুরার জনগণের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের ফলে, এটি ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে উত্তর-পূর্ব পুনর্গঠন আইন, ১৯৭১ অনুযায়ী পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত লাভ করে।

দর্শনীয় স্থান

আগরতলার প্রধান আকর্ষণ হলো উজ্জয়ন্ত প্যালেস স্টেট মিউজিয়াম, ট্রাইবাল মিউজিয়াম, সুকান্ত একাডেমি, এম.বি.বি. কলেজ, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, উমা মহেশ্বর মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, বেনুবন বিহার, গেদু মিয়া মসজিদ, মালঞ্চ নিবাস, রবীন্দ্র কানন, হেরিটেজ পার্ক, পূর্বাশা, হস্তশিল্প ডিজাইনিং সেন্টার, চৌদ্দ দেবী মন্দির, পর্তুগিজ চার্চ ইত্যাদি।

বাসস্থান

গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউস, যাত্রিকা, ভগত সিং ইয়ুথ হোস্টেল এবং প্রাইভেট হোটেল উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর ও ত্রিপুরা

রাজা বীর চন্দ্র মাণিক্যকে (১৮৬২-১৮৯৬) ৬ মে, ১৮৮৬ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম চিঠি লেখেন। এরপর বীরচন্দ্রের পুত্র এবং উত্তরসূরি রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও (১৮৯৭-১৯০৯) ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই ১৯০০ সালে কবি প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা সফর করেছিলেন। এছাড়া ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ সপ্তম এবং শেষবার আগরতলা সফর করেন যখন রাজা বীর বিক্রমের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা

আগরতলার ব্যস্ত সড়ক ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ত্রিপুরা সংযুক্ত হয়েছে অসমের মধ্যদিয়ে লামডিং এবং শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন দ্বারা। ত্রিপুরার প্রধান রেল স্টেশনগুলো হলো আগরতলা, ধর্মনগর এবং কুমারঘাট। এছাড়া ৮নং জাতীয় সড়কও ত্রিপুরাকে অসমসহ সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

আগরতলা বিমানবন্দর হলো এ রাজ্যের প্রধান বিমানবন্দর এবং এখান থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি এবং শিলচরের উদ্দেশে নিয়মিত উড়ান রওনা দেয়।

ভারতের প্রধান টেলিযোগাযোগ সংস্থাগুলোর অধিকাংশই ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্থিত এবং এগুলো রাজধানীসহ রাজ্যের অন্যান্য অংশে দূরভাষ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করে।

শিল্প ও সংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এটি রিয়াং উপজাতিদের 'হোজাগিরি' নৃত্যের ছন্দময় শারীরিক মুদ্রায় যেমন প্রতিফলিত হয় তেমনি অ-উপজাতিদের 'মনসামঙ্গল' বা 'কীর্তন' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, নববর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত আদিবাসীদের 'গড়িয়া' নৃত্য এবং 'গরিয়া' পূজা এবং অ-আদিবাসীদের 'ধামাইল নৃত্য' গ্রামীণ অঞ্চলে পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো আয়োজিত হয়। পাশাপাশি গ্রামের আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছড়াকারের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রসহ কবিগানের দ্বৈরথ ত্রিপুরার অন্যতম লোকগান।

উৎসব

রাজ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো উপজাতীয় এবং অ-উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। গড়িয়া, দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, খারচি, পৌষসংক্রান্তি, বিজু বা বড়দিনের উৎসব রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যের কিছু প্রধান উৎসব

গড়িয়া : গড়িয়াকে গৃহস্থের পরোপকারী চেতনার দেবতা বলা হয়। গড়িয়া নৃত্য এই উৎসবের উপর ভিত্তি করে। এটি ত্রিপুরি এবং অন্যান্য কাকবোরোকভাষী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব। এপ্রিল মাসে পালিত এটি ভক্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। ওচাই নামে পরিচিত পুরোহিত পূজা করেন। পুজোর সময় যুবকরা বাদ্যসহ গান ও নাচ করে।

দুর্গাপূজা : মূলত বাঙালি হিন্দুরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজা করে। এ পূজা এতটাই বিস্তৃত যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা : বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ভগবান বুদ্ধের জন্ম, জ্ঞানার্জন এবং মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য উদ্‌যাপন করে। এটি এপ্রিল মাসে হয়। এই অনুষ্ঠানটি রাজ্যজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। আগরতলার ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দির ভেনুবন বিহার আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

খারচি : এই উৎসব আজও অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কথিত আছে যে ত্রিপুরার রাজপরিবার এই উৎসব বা পূজার সূচনা করেছিল যখন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল পুরাতন আগরতলায়। এখন এটি সর্বজনীন উৎসব যা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মিলন ঘটায়। খারচির সময় চৌদ্দ দেবতার মাথার মূর্তি পূজা করা হয়। সরকার গত কয়েক বছর ধরে এই উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ধর্মীয় উপাসনা ও প্রার্থনা নয়, জুলাই মাসে উৎসবের দিনগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

তীর্থমুখ মেলা : পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে তীর্থমুখে বিশাল মেলা বসে। আদিবাসী এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেখানে সমবেত হয়। এখানে আগত ধর্মপ্রাণ মানুষরা এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রাইমা ও সুরমা নদীর জলে পুণ্যস্নান করেন।

বিজু : চাকমা উপজাতির সবচেয়ে বড় উৎসব বিজু। চৈত্রের শেষ দিন শুরু হয়ে তিন দিন ধরে চলে এই উৎসব। ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা, প্রচুর উৎসব খাওয়া, গান, নাচ, খেলা এবং খেলাধুলা–এই উৎসবের সময় প্রধান আকর্ষণ। এটি তাদের জুমভিত্তিক জীবিকা এবং সামাজিক সম্পর্ককে উপস্থাপন করে যা বিজু নৃত্যের মাধ্যমে চিত্রিত হয়। এ উৎসব প্রতিবছর এপ্রিলের মাঝামাঝি রাজ্য সরকারের সহায়তায় আয়োজন করা হয়।

ওওয়া : আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মগ সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করে। নারী-পুরুষ দিনের বেলায় বৌদ্ধ মন্দিরে যায় এবং সন্ধ্যায় তারা কাগজ ও খেলনা নৌকা নদীতে ছেড়ে দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে ভগবান বুদ্ধ অন্ধকারের দেশের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেন এবং তার এই পথকে আলোকিত করার জন্য মোমবাতি জ্বালানো হয়।

বড়দিন : ত্রিপুরার কিছু উপজাতির মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের ফলে বড়দিন এখন একটি বড় উৎসব। শুধু খ্রিষ্টানরাই নয়, অন্যান্য ধর্ম-অনুসারীরাও এখন এই অনুষ্ঠানটিকে সমানভাবে উপভোগ করে। দিনটিকে ঘিরে কেনাকাটা, কেক, সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা হয়।

ধর্ম

১৯৪১ সালে ত্রিপুরার জনসংখ্যায় হিন্দু ছিল ৭০%, মুসলিম ছিল ২৩% এবং ৬% ছিল বিভিন্ন উপজাতি ধর্মাবলম্বী। এছাড়াও রয়েছে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর বাস। এটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ১৯৫১ সালে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ৬৪৯৯৩০ জন। যা ১৯৪১ সালে ছিল আরও কম।

হিন্দুধর্ম : বাঙালি এবং উপজাতি মিলিয়ে ত্রিপুরার অধিকাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বীই শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজতান্ত্রিক আমলে হিন্দুধর্মই ছিল ত্রিপুরার রাজধর্ম। সমাজে পূজারী ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। ত্রিপুরার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপাস্য প্রধান দেবদেবীগণ হলেন শিব এবং শক্তির অপর রূপ দেবী ত্রিপুরেশ্বরী।

ত্রিপুরায় হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা, নবরাত্রি, কালীপূজা ইত্যাদি। এছাড়াও ত্রিপুরায় পালিত হয় গঙ্গা উৎসব, যাতে

ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দেবী গঙ্গার উপাসনা করে থাকেন।

ইসলাম : ভারতের অন্যান্য অংশের মতোই ত্রিপুরাতেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো মুসলিম। ত্রিপুরার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত।

খ্রিষ্টধর্ম : ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরায় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১০২৪৮৯। রাজ্যের অধিকাংশ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীই ত্রিপুরি এবং অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ত্রিপুরার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য শাখা হলো ত্রিপুরা ব্যাপ্টিস্ট খিষ্টান ইউনিয়ন নামক সংগঠনের অধীনস্থ ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়। সারা রাজ্যে এই সংগঠনের ৮০০০০ সদস্য এবং প্রায় ৫০০ গির্জা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় হলো রোমান ক্যাথলিক গির্জা এবং এই সম্প্রদায়ের ২৫০০০ সদস্য রয়েছেন।

অর্থনীতি

ত্রিপুরার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। প্রাথমিক খাত (কৃষি) রাজ্যের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৬৪% এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পণ্যের (ঝউচ) প্রায় ৪৮% অবদান রাখে। ত্রিপুরায় আনারস, কমলা, কাজুবাদাম, কাঁঠাল, নারকেল, চা, রাবার ইত্যাদির মতো উদ্যানপালন/বৃক্ষরোপণ শস্যের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন হয়।

লোকনৃত্য

ত্রিপুরার প্রধান লোকনৃত্যগুলো হলো রেয়াং সম্প্রদায়ের হোজাগিরি নৃত্য, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গড়িয়া, জুম, মাইমিতা, মাসাক সুমানি ও লেবাং বুমনি নৃত্য, চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু নৃত্য, লুসাই সম্প্রদায়ের চেরা ও স্বাগত নৃত্য, গারো সম্প্রদায়ের ওয়ানগালা নৃত্য, মগ সম্প্রদায়ের সাংগ্রাইকা, চিমিথাং, পদিশা ও অভঙ্গমা নৃত্য, কালাই ও জামাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য, বাঙালি সম্প্রদায়ের গাজন, ধামাইল শাড়ি ও রবীন্দ্রনৃত্য এবং মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসন্ত রাশ ও পুং চালাম নৃত্য। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। কয়েকটির নাম হলো–'খাম্ব (ঢোল)', 'বাঁশের বাঁশি', 'লেবাং', 'সারিন্দা', 'দোতারা' এবং 'খেংরং' ইত্যাদি।

গড়িয়া নাচ : এপ্রিলের মাঝামাঝি যখন জুমের জন্য নির্বাচিত জমিতে বীজ বপন করা শেষ হয়, তখন তারা একটি সুখী ফসলের জন্য ঈশ্বর 'গরিয়া'র কাছে প্রার্থনা করে। এ সময় এপূজা সাত দিন ধরে চলতে থাকে।

লেবাং বুমানি নাচ : পুরুষ-লোকেরা যখন তাদের হাতে দুটি বাঁশের চিপের সাহায্যে একটি অদ্ভুত ছন্দময় শব্দ করে, তখন মহিলারা 'লেবাং' নামক এই পোকা ধরার জন্য পাহাড়ের ঢালে ছুটে যায়। বাঁশের চিপা দ্বারা তৈরি শব্দের ছন্দ পোকামাকড়কে তাদের লুকানোর জায়গা থেকে আকৃষ্ট করে এবং দলে দলে মহিলারা তাদের ধরে ফেলে।

হোজাগিরি নাচ : হোজাগিরি নাচ কোমর থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত নড়াচড়ার মাধ্যমে একটি বিস্ময়কর তরঙ্গ সৃষ্টি করে। মাটির কলসিতে দাঁড়িয়ে মাথায় বোতল এবং তার ওপর জ্বলন্ত বাতি, যখন রিয়াং বেলে নাচ ছন্দময়ভাবে শরীরের নীচের অংশে মোচড় দেয়, তখন এ নাচ দর্শকদের ভীষণ মুগ্ধ করে।

বিজু নাচ : বিজু মানে 'চৈত্রসংক্রান্তি'। 'চৈত্রসংক্রান্তি' বাংলা ক্যালেন্ডার বছরের সমাপ্তি বোঝায়। এই সময়কালে চাকমারা সবেমাত্র শেষ হওয়া বছরটিকে বিদায় জানাতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গান গায় এবং নাচ করে।

হাই-হাক নাচ : ফসল কাটার মরসুম শেষে দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করে। তারা তাদের বিখ্যাত হাই-হক নাচের জন্য এই উৎসবের আয়োজন করে।

ওয়ানগালা নাচ : 'ওয়ানগালা' উপলক্ষে সাংনাকমা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিটি বাড়িতে যান এবং পূজার অংশ হিসেবে একটি কুমড়ো কাটেন। এই উপলক্ষ্যে এই কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। এরপর মহিষের শিং দিয়ে তৈরি 'দামা' ও 'আদুরি'র তালে তালে নাচে নারীরা। নৃত্যটি যুদ্ধের মহড়ার মতো।

স্বাগতম নাচ : যখনই কোনো দর্শনার্থী তাদের বাড়িতে আসেন লুসাই মেয়েরা রঙিন কাপড় পরে স্বাগতনৃত্য পরিবেশন করে। এটি অত্যন্ত রঙিন নাচ যেখানে সমগ্র সম্প্রদায়ের অল্পবয়সী মেয়েরা অংশ নেয়।

চেরাউ নাচ : গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে–অর্থাৎ প্রসবের সময় বা আগমুহূর্তে আত্মীয়রা দিনরাত এই 'চেরাউ' নাচটি দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করে যাতে সেই সন্তানপ্রসবা মহিলার মনে সাহস ও আস্থা জাগ্রত হয়।

দেবলাল বিশ্বাস
শিক্ষক

সাংগ্রাই নাচ : চৈত্র মাসে সাংগ্রাই উৎসব উপলক্ষে মগ সম্প্রদায়ের লোকেরা সাংগ্রাই নৃত্য পরিবেশন করে। বিশেষ করে তরুণ ছেলেমেয়েরা নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। •

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

সমাজ-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিকাশধারায় বাংলাদেশের বাগদি জাতি

মিলন রায়

ইতিহাস

'বাঘ বাগদি হড়েল পাখি
পোষ মানে না এ তিন জাতি।'

বাংলাদেশের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম বাগদিরা ছিলেন বাংলার আদিম অধিবাসীগণের রক্তধারার বাহক। প্রাচীন গ্রিস দেশীয় লেখকদের রচনাবলি থেকে জানতে পারা যায় বাগদি সম্প্রদায়ই ছিল মৌর্যযুগ পর্যন্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। ঋকবেদে উল্লিখিত 'বঙ্গদ' জাতির বংশধর বলেও অনেকে মনে করেন। রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র রায় তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তৎকালীন বাংলার জাতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে ছত্রিশটি জাতির কথা বলেছেন, তার মধ্যে বাগদি জাতির উল্লেখ আছে। পঞ্চপাণ্ডবরা যখন বনবাসে যান তখন বাগদিদের জঙ্গলে নিয়ে যান জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য। বনে জঙ্গলে বসবাস করার জন্য তাদের নামকরণ হয় বুনো। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় ও আদি অস্ট্রেলীয়দের মিল দেখা যায়। বাগদিদের চ্যাপটা নাসাকৃতি তাঁদের অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার প্রমাণ দেয়। বাংলাদেশে অনান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাশাপাশি পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় ও বাগদিদের সংখ্যা অনেক; তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাষায়–'বাস্তবিক বাগদিদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না, অনেকে বাগদি ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।' প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ই. টি. ডালটন বাগদিদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন যারা হিন্দু জাতির বিভিন্ন নিম্নসম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আদিম জনজাতির চেহারার বিবর্তন ঘটিয়েছিল

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এদেরকে আদিবাসী উপজাতি এবং অপরাধপ্রবণ উপজাতি বলেছেন, যারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ ধরে, কাঠ কেটে এবং মুটের কাজ করে জীবন নির্বাহ করে থাকে। ওল্ডহ্যামের মতে বাগদি সম্প্রদায় মাল জাতিরই এক উপশাখা মাত্র। এইচ.এইচ. রিজলে বাগদি সম্প্রদায়কে দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত কৃষি ও মৎস্যজীবী এবং ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের বর্ণনায় বাগদি সম্প্রদায়কে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ডোম, মুচি, চামার প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে অপরাধপ্রবণ জাতি (ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস) বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের এই অন্ত্যজ শ্রেণিরা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হতো।

২.

উৎপত্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক অভিমত প্রচলিত আছে। একটি মতে বলা হয়েছে পার্বতী জেলেনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে শিবের মন ভোলানোর চেষ্টা করলে শিব পার্বতীর প্রতি বিরূপ হয়ে বলেন, তাঁর সন্তান বাগদি হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং জেলে হয়ে মাছ শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করবে। অন্য একটি কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে শিব কোচবিহারে সংসার ধর্ম পালন করাকালীন পার্বতী জেলেনির ছদ্মবেশে কোচদের ফসল নষ্ট করলে তাকে প্রস্থান করতে বাধ্য করে। তাঁর চার কন্যা থেকে চারটি বাগদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় রীতি অনুযায়ী সীতার পরিচর্যাকারী রমা নামে এক বিধবা মহিলার গর্ভে বাগদিরা জন্মগ্রহণ করে। চতুর্থ রীতি অনুযায়ী বাগদিদের জন্ম হয়েছিল এক দেবীর গর্ভে। বাগদিদের উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিভিন্ন লোককথার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে তাতে লোকসংস্কৃতির আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশি। বাংলাদেশের বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে কাশ্যপ গোত্র, শাল গোত্র, শাখ গোত্র, গজার গোত্র, আলেম্বান গোত্র, কাশ্যপ গোত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি গোত্রের প্রতীক দ্রব্যগুলো বা প্রাণীগুলো সেই গোত্রভুক্ত বাগদিদের কাছে অচ্ছুৎ। যেমন কাশ্যপ গোত্রের মানুষেরা তাদের বিয়ে ও শ্রাদ্ধে কাশফুল ব্যবহার করে না। তেমনি শাল গোত্রের বাগদিরা শাল কাঠ ব্যবহার করতে পারে না। আবার শাখ গোত্রের মেয়েদের কাছে বিয়ের পর শাখা পরা নিষিদ্ধ। একই ভাবে গজার গোত্রের বাগদিরা গজার মাছ খান না। আলেম্বান গোত্রকে তারা উচ্চ পর্যায়ের বলে মনে করে। সর্বোপরি কোনো বাগদি যদি তার নিজ গোত্রের পরিচয় দিতে না পারে তাহলে তাকে কাশ্যপ গোত্র বলে মনে করতে হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলাগুলো যেমন বৃহত্তর ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, বাখেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি একাধিক জেলায় বাগদি সম্প্রদায়ের বসতি দেখতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলাতে হিন্দু জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বাগদি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এরা মূলত জেলার উত্তর ও পশ্চিম অংশে বসবাস করেন। তারা কঠোর পরিশ্রমী এবং রাস্তা তৈরি, মাটি কাটার কাজ করেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বেশিরভাগ মানুষেরা কৃষিকাজ, মাছ ধরে, কেউ মৎস্যজীবী, পালকি বাহকের কাজ, কাঠুরিয়ার (বছরের নির্দিষ্ট সময়ে) চটের থলি প্রস্তুত করে, দৈনিক মজুরির কাজ করে চরম দারিদ্র্য সঙ্গে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে এরা ইটভাটায় শ্রমিক, ছাদ পেটানো, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কাজও করে থাকেন। বাগদি সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ভূমিহীন, তাই নিজ কৃষি বলে কিছুই নেই। কম পারিশ্রমিকের নীল শ্রমিক হিসেবেই তাদেরকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাজবাড়ী জেলার বাগদিরা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা ও ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১,৩২,৯২৬ জন বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাগদি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বজায় রেখে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বসবাস করছে। কঠোর জীবন সংগ্রামে মূলত দারিদ্র্যের কারণে কোণঠাসা হয়েও তারা তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে চলমান সভ্যতার জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে তারা বৃহত্তর জীবনপ্রবাহে মিলে গেছে।

৩.

সমাজ জীবনে বিবাহ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একজন তেঁতুলিয়াকে অবশ্যই তেঁতুলিয়া সম্প্রদায়ে বিবাহ করতে হতো। কিন্তু শালঋষি প্রবরের কোনো সম্প্রদায় তার নিজের গোত্রের কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। সামাজিক ও আর্থিক কারণ বিশেষত তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে যাতে কেউ তাদের সম্পদ ভোগ করতে না পারে তার জন্যই বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাগদি সম্প্রদায়ের উচ্চ ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বাল্য ও বয়স্ক বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেও বাল্যবিবাহের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বিয়ের পূর্বে বরের পিতা গ্রামের প্রতিবেশী বয়স্কদের বিয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। অনুমতি প্রদানের পর তাদেরকে দইসহ মুড়ি, মুড়কি পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি 'শুক চিড়ে' নামে পরিচিত। বাগদিসমাজে বিবাহের অপর একটি অনুষ্ঠান হলো 'গায়ে হলুদ'। ঐ উপলক্ষ্যে গ্রামের সধবা ও কুমারী মেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হয়। বর নিজে ও কন্যাপক্ষে কন্যার মা বা বোন নিমন্ত্রণ করার কাজ করেন। বিয়েরদিন বর ও কনের পরিবারে মেয়েরা পিতলের 'গাড়ু' তে করে পুকুরঘাট থেকে জল আনে যা 'জল সরতে' নামে পরিচিত। আর্থিক স্বক্ষমতা থাকলে বাজনার বন্দোবস্ত করে। পাঁচজন বা নয়জন সধবা নারী মিলিতভাবে বর বা কনেকে তেলহলুদ মাখায়। তারপর পুকুর থেকে আনা জল দিয়ে তাদের স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরানো হয়। বিকালে বর ও কন্যাকে নাপিত বা নাপিতানীর কাছে আলতা পরতে হয় যা 'সুতো পরানো' নামে পরিচিত।

বিয়ের দিন খুব ভোরে পাত্রকে গ্রামের মহুয়া গাছের নিচে নিয়ে যায় মৌখিক বিবাহের জন্য। বাগদি সম্প্রদায়ের কাছে মহুয়াগাছ ও তার পাতা পবিত্রতার প্রতীক। মহুয়া গাছের ছোট ডাল ভেঙে জলে চুবিয়ে তা আগত বিবাহিত নর-নারীদের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মাথায় ঐ জল পড়লে তাদের বিবাহ হয় না। এরপর মহুয়াগাছ আলিঙ্গন করে তাতে সিঁদুর লেপন করে পাত্রের ডান হাতের কব্জিতে সুঁতো বেঁধে দেওয়া হয়। ঐ একই সুতো মহুয়াগাছেও বেঁধে

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। –সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

দেওয়া হয়। বিয়ের দিনে কোনো কোনো অঞ্চলে একদিন পূর্বে 'আইবুড়ো ভাত' হয়। বর বা কন্যার পরিবারের মেয়েরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না করে কয়েকজন কুমারী মেয়েকে খাওয়ায়। পালকি বা অন্য কোনো যানে বিয়ে যাত্রা করার পূর্বে বরবেশী পুত্রকে মা জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় যাচ্ছো, বাবা?' বর উত্তর দেয়, 'তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।' কনেবাড়ি পৌঁছালে কনের পিতা, কাকা বা নিকট কোনো আত্মীয় কোলে তুলে 'বরাসন' এ বসায়। কনের ঠাকুমা-দিদিমা-স্থানীয়রা বরকে মিষ্টিজল খাওয়ায়। এরপর বরকর্তার অনুমতি নিয়ে বিবাহকার্য শুরু হয়। গোটাপানে মুখ ঢাকা কনেকে একটি পিঁড়ির ওপর বসিয়ে বিবাহসভায় আনা হয়। বরকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে রেখে কনেকে বরের চারপাশে সাতবার ঘোরানো হয়। এরপর একটা পাতলা চাদরে দুজনের মাথা ঢেকে 'শুভদৃষ্টি' সম্পন্ন হয়। এর পর 'ছাওলা তলা'য় বর ও কনেকে মুখোমুখি বসিয়ে বরের ডান হাতের ওপর কনের ডান হাত বন্ধন করে তা জোড়া সরার ওপর রেখে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে চলেন–

'অরণ্যের ফল, পুস্করিণীর জল এবং উভয় স্থানের দূর্বাঘাসসহ এই কন্যা আমি সম্প্রদান করলাম...।'

এর পর বরবধূকে বাম পাশে রেখে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে আগুনে ঘৃতাহুতি দেন। তখন বর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একটি টাকার সাহায্যে কনের সিঁথিতে তিনবার সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এটিই 'সিঁদুর দান' নামে পরিচিত। এরপর বরকনে দুইজন পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বর বধূর করতলের নিচে নিজ করতল রেখে 'খলা মঙ্গল'র সময়ে ভাজা খৈগুলো আগুনে আহুতি দেয়। বরের বাড়িতে বর বধূ পৌঁছালে তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে 'বৌ দেখানো'র জন্য তাদেরকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। এই সময় তারা গ্রামের সমস্ত মন্দির, হাজরাতলা, ষঠীতলা প্রভৃতি স্থানে প্রণাম করে আসে। এরপর বাড়িতে পৌঁছালে বর বধূকে রান্নাঘরে রন্ধন পাত্রসহ সমস্ত জিনিসকে প্রণাম করে যা 'যজ্ঞহাঁড়ি প্রণাম' নামে পরিচিত। বিয়ের চারদিন পরে বর ও কনে গায়ে হলুদের দিনে বাধা দূর্বাঘাসসহ হলুদ রঙের সুতো পরস্পরের হাত থেকে খুলে ফেলে।

বাংলাদেশের বাগদিরা বিধবা বিবাহকে অচ্ছুৎ মনে করত না, তবে পণ হিসাবে কাঁসার তৈজসপত্র প্রদান আবশ্যিক ছিল। 'সানগা বা সাঙ্গা' নামে পরিচিত এই বিবাহে কোনো ব্রাহ্মণ মন্ত্র বৈদিক স্তোত্র কোনো কিছুই উচ্চারিত, এমনকি বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অগ্নিও প্রজ্বলিত করা হতো না। উচ্চহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাগদিদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত ছিল। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, অবাধ্য বা ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হতো তাহলে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ হতো। তারা সনগা প্রথায় পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন।

৪.

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বাগদি সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, উৎপীড়িত ও ভদ্রসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন এই বাগদি সম্প্রদায় ভয়ঙ্কর শোষণ উৎপীড়ন ও চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্রমে পরাজিত হতে থাকে। ১৭৭০ খ্রি. এর ভয়ংকর সর্বনাশা মন্বন্তর বাংলার জীবন ধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত হতে বাধ্য করে। এর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা না পেয়ে যেখানে বহু জমিদার বাড়তি রাজস্বের চাপে ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানে গরিব বাগদিদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এর সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি বাগদিদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার শক্তিকে নিংড়ে নেয়। সর্বস্বান্ত বাগদিরা বিকল্প কোনো জীবিকার সন্ধান করতে না পেরে বাধ্য হয়ে তারা ডাকাতির পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশের বাগদিরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ডাকাতি করত। বিভিন্ন বন্য উপজাতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা লুণ্ঠন করে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'পাথরের মতো শরীর, বনবাবরি চুল, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে লম্বা তেল চকচকে লাঠি, রাতে কালীপূজা করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হতেন।' তবে তারা লুণ্ঠিত অর্থ গরিব মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

বাংলাদেশের সুন্দরবনের বাগদি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ শামুক ও জোংরা কুড়িয়ে তা পুড়িয়ে চুন তৈরি করে যা তাদের অন্যতম একটি আদি পেশা। তাদের মধ্যে ভূমিহীন শ্রমিক বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁদের মধ্যে শিশুশ্রম একটি সাধারণ বিষয়। মাছ ধরার জাল তৈরি করা তাঁদের অপর একটি পেশাগত শিল্পকর্ম। বাগদি মৎস্যজীবীরা বিপদসংকুল বিভিন্ন নদীতে সাধারণত তিনভাবে মাছ ধরেন–(১) নদীতে মাছ ধরা, (২) পুকুরে বা জলাশয়ে মাছ ধরা ও (৩) বাগদা মীন সংগ্রহ। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পুষ্টির যোগান দিলেও তাঁরা নিজেদেরই পুষ্টি জোগাড় করতে পারেন না। তাছাড়া ধরা মাছের উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় তাঁরা সমাজের সব থেকে অসংগঠিত, পশ্চাৎপদ রয়ে গেছেন। এইরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অনেককে কাঠ কাটা বা মৎস্য সংগ্রহের চিরাচরিত পেশা পরিত্যাগ করে ভ্যান চালানো, ইট ভাটায়, পল্ট্রি ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা সত্ত্বেও তাদের জীবন সংগ্রাম থেমে থাকে না। সব ভয়ংকর প্রতিকূলতাকে জয় করে তাদের সংগ্রামশীল জীবনের গতিধারা এগিয়ে চলে। সুন্দরবনের নানা জাতি ও আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে বজায় রাখলেও তাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনে নানা পরিবর্তনের ছোঁয়া এসেছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা বৃহত্তর সমাজের সামাজিক ও সংস্কৃতির স্রোতে মিলেমিশে সুন্দরবনে এক নতুন জনজাতি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। বাগদি সম্প্রদায় মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন শক্তিদেবীর পূজারি। যেহেতু জল জঙ্গল বাগদি সম্প্রদায়ের আশ্রয় ও জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র ছিল তাই তাদের মধ্যে মনসা দেবীর পূজা বেশি প্রচলিত ছিল। শ্রাবণ মাসে মূলত মনসা পূজা হয়। এছাড়া কার্তিক মাসে কালীপূজা, ভাদ্র মাসে ভাদো পূজা, চণ্ডী, শীতলা, ভবানী, ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন পূজা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে হতে দেখা যায়।

৫.

শিক্ষাক্ষেত্রে বাগদি সম্প্রদায় অনেক অনগ্রসর। দারিদ্র্যের কারণেই বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়েরা শিক্ষা লাভে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। জীবিকার সন্ধানে তাদেরকে শিক্ষার পরিমণ্ডল ছেড়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত, পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক বাগদি সম্প্রদায়ের শ্রেণির শিক্ষার উন্নতি বিধানে সরকার বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তা বাগদি সম্প্রদায়ের আঙিনায় পৌঁছাতে পারেনি। বেশিরভাগই প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চতর শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বাধা অনেক। তবে সেই বাধা দূর করে বর্তমানে অনেকটা অগ্রগতি ঘটেছে, যার প্রভাব বাগদি সমাজের স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিসহ তাদের বহু দিনের অনুন্নত জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সহজ সরল মানসিকতার বাগদিদেরকে নানাভাবে শোষণ ও তোষণ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করে তাঁদেরকে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা বাগদি সম্প্রদায়ের জীবনধারণে নানা পরিবর্তন এনেছে। সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি তাদের মূল্যবোধের নানা পরিবর্তন ঘটছে। নিম্নতম ধাপে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি যেমন বাগদি, বাউরি, মুচি, ডোম এবং হাড়ি–তাঁদের তুলনায় উচ্চজাতিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাদের মূল সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিল। বিভিন্ন উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বহুদিন বসবাসের ফলে নিম্নবর্ণের এই বাগদি সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তারা ভুলে যায়নি, তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই সহজ সরল প্রান্তিক বাগদি সম্প্রদায়েরও মূল সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া কাম্য নয়। বরং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'শূদ্র চাঁড়াল বাগদি' বলার দিন চিরতরে শেষ হয়ে যাক।

মিলন রায়
সহকারী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ, কলকাতা

'ছোট বলে ত্যাজো কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে এলেন ব্রজের কানাই।
শূদ্র চাঁড়াল বাগদি বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন
দেখছি রে তাই।।' •

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

অসমিয়া সাহিত্যের প্রাণপুরুষ

সৈয়দ নূরুল আলম

অসমিয়া ভাষার লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। লিখতেন কৃপাবর বরুয়া ছদ্মনামে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ সনের ১৬ অক্টোবর এবং ১৯৩৮ সনের ২৬ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁকে আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের পদপ্রদর্শক বলা হয়। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সমালোচনা, প্রহসন, জীবনী, আত্মজীবনী, শিশুসাহিত্য, ইতিহাস, সাংবাদিকতা ইত্যাদিতে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর বাবার নাম দীননাথ বেজবরুয়া এবং মাতার নাম ঠানেশ্বরী দেবী। বাবার ছিল বদলির চাকরি। যে কারণে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে তেজপুর, লক্ষীমপুর, গুয়াহাটিসহ নানান জায়গায় পড়াশোনা করতে হয়েছে। অবশেষে তিনি শিবসাগর থেকে ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯০ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম প্রজ্ঞাসুন্দরী। প্রজ্ঞাসুন্দরী ছিলেন কলকাতার ঠাকুর পরিবারের কন্যা।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া একসময় আইন বিষয়ে পড়ালেখা করেছিলেন কিন্তু আইনের ওপর পড়া শেষ না করে গুয়াহাটির বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বরুয়া-ফুকন ব্রাদার্সের ম্যানেজার ভোলানাথ বরুয়ার সঙ্গে পরিচয় হলে, দুইজন মিলে কলকাতায় কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। এ ব্যবসার জন্য তিনি ১৯১৭ সালের দিকে কিছু দিন সম্বলপুরে বসবাস করেছিলেন। তিনি সম্বলপুর, বরোডা, নাগপুর, মুম্বাইতে কাটিয়ে জীবনের শেষসময়, ১৯৩৮ সালের দিকে অসমে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখনে তাঁর সাথে চন্দ্রকুমার আগরয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁরা একত্রিত হয়ে অসমিয়া ভাষা উন্নতির জন্য 'সাধিনী সভা' নামক একটি সভা গঠন করেন। এবং এখানে থেকে ১৮৮৯ সালে 'জোনাকি' নামক একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। মূলত এই সময় থেকে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বহুমুখি সাহিত্যজীবন শুরু হয়। জোনাকি প্রকাশের প্রথম বছরের প্রথম প্রকাশন হিসেবে লিতিকাই নামক প্রহসনি প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হওয়া 'বাহী আলোচনী'র তিনি প্রতিস্থাপক ও সম্পাদক ছিলেন। বাহী আলোচনীর মাধ্যমে তিনি সফল সাহিত্যিক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সমসাময়িক চেতনা, আলোচনী, জন্মভূমি, মিলন, অসম সাহিত্যসভা পত্রিকা, অরুণ, আবাহন, বরদৈচিলা, ন-জোন, জয়ন্তী, দৈনিক বাতরি, অসম বন্তি ইত্যাদিতে সম্পাদনার কাজ করেছেন।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কয়েকটি সাহিত্যকর্ম : মোর জীবন সোঁওরণ, মোর জীবন সোঁওরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), ডাঙারিয়া দীননাথ বেজবরুয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, শ্রীশ্রী শংকরদেব, শ্রীশ্রী শংকরদেব আরু মাধবদেব (আত্মজীবনী ও জীবনী); তত্ত্বকথা, শ্রীকৃষ্ণকথা, ভগবৎ কথা (প্রবন্ধ), পদুমকুঁয়রী (উপন্যাস); সুরভি, সাধুকথার কুঁকি, জোনবিরি, কেহোঁকলি (গল্প); বুঢ়ী আইর সাধু (শিশুসাহিত্য); লিতিকাই, নোমল, পাচনি, চিকরপতি-নিকরপাত, গদাধর রাজা, বারেমতরা, হ-য-ব-র-ল, হেমলেত, মঙলা, চক্রধ্বজ সিংহ, জয়মতী কুঁয়রী, বেলিমার (নাটক)। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি হাস্যরসাত্মক রচনা ও অনুবাদ গ্রন্থ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি পেয়েছে একাধিক সম্মান। যেমন : অসম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতি (১৯১৬ সালে, গুয়াহাটী), অসম সাহিত্য সভার সভাপতি (১৯২৪ সালে, গুয়াহাটী), রসরাজ উপাধি ও সাহিত্যরথী উপাধি।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কবিতায় সমকালীন যুগমানসের প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কবিতায় প্রেমভাবনা, নিসর্গভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি আপন কবিচেতনায় জীবনে সুখ ও দুঃখের অবিচ্ছেদ্য অবস্থান লক্ষ্য যেমন করেছেন, এই দুইয়ের যৌগপত্যেই জীবনকেও উপলব্ধি করেছেন। নিসর্গের বর্ণনায় তিনি প্রকৃতির রূপ-রস-রঙ ও শব্দের সমাহারে যে সুন্দরের আভাস আসে সেকথা বলেছেন। তাঁর স্বদেশি ভাবধারা পুষ্ট কবিতাগুলো স্বদেশীয় যুগে অসময়ীদের মনে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে, 'আমার জন্মভূমি', 'মোর দেশ', 'অসম সংগীত', 'বীণ' ইত্যাদি।

'এই রূপ, -অ মোর আপন দেশ/ অ মোর চিকুণী দেশ/ এনেখন শুরল/ এনেখন সুফলা...' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার লেখা এই গানটি ১৯২৭ সালে অসম রাজ্যের রাজ্য সঙ্গীত রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বহুজাতি ও উপজাতির মিলনভূমি অসমের অন্তরঙ্গ জীবনছবির সন্ধানে তিনি অসমের লোকজীবন থেকেও কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তিনটি ঐতিহাসিক নাটক ও চারটি হাস্যরসাত্মক লঘু নাটক লিখেছিলেন। তিনি মূলত তাঁর দেখা অসমিয়া জীবনের অসঙ্গতি, ভুল-ভ্রান্তিকে এই রচনাগুলোতে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। তাঁর লেখাগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, 'লিতিকাই'-তে তিনি মানুষের পরস্পরকে প্রতারণা, মিথ্যাচার, খলতাকে রসসমৃদ্ধরূপে প্রকাশ করেছেন। একই ভাবে, 'পাচনী'তে পাচনীর অতিথি বৎসলতার বাড়াবাড়ি একটি চরম হাস্যকর অবস্থায় পৌঁছেছে। এবং 'নোমান' কৌতুক নাটিকা নহর ফুটুকা নামে এক কুঁজো বৃদ্ধের হাস্যকরতার কাহিনি। 'চিকরপতি মিকরপাত' দুই চোরের চুরির ফন্দিফিকির ও বিচার বিভাগের অপদার্থতার শ্লেষাত্মক কাহিনি।

কৌতুকনাটিকা রচনায় লক্ষ্মীনাথের সহজাত দক্ষতার পরিচয় মেলে। চরিত্র, সংলাপ, কৌতুককর পরিস্থিতির নির্মাণে তিনি সত্যিই মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'জয়মতীকুমারী'তে রানী জয়মতীর স্বামী ও স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ বর্ণিত হয়েছে। 'চক্রধরসিংহ' নাটকে লাচিত বরফুকন কর্তৃক সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘল সেনাদের প্রতিহত করার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'বেলিমার' নাটকে আহোমরাজাদের ক্রমাবনতির ইতিহাস, বর্মীদের আক্রমণে যার দুঃখদায়ী পরিণতি ঘটে। এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, ঐতিহাসিক নাটক রচনাকালে তিনি ঘটনার ঐতিহাসিকতাকে বিকৃত করেননি। তিনি বরং ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, ঘটনা ও চরিত্রাবলিকে নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এবং নাটকের মধ্যে তিনি বীরত্ব, স্বদেশপ্রেমকে নাটকীয় রূপেই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আসামের জাতীয়তাবোধের বিকাশে নাটকগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে প্রাণপুরুষ বলা হয়। •

সৈয়দ নূরুল আলম ॥ কবি ও কথাসহিত্যিক

মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ৮ অক্টোবর ২০২৩-এ বিহার রাজ্য সরকারের একটি প্রতিনিধিদল কর্তৃক আয়োজিত একটি ইনভেস্টরস্ মিট্-এ বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে ব্যবসার জন্য বিহারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করা হয়। এই সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম।

মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলকের সঙ্গে ঢাকায় ৪ অক্টোবর ২০২৩-এ বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'সাইবার মৈত্রী ২০২৩'-এর সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করেন। সাইবার-মৈত্রী হলো ভারত ও বাংলাদেশের সেক্টর বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও প্রফেশনালগণের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম ও ইন্টারফেস যার লক্ষ্য সাইবার নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা।

কুমিল্লা সফরকালে মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩ অক্টোবর ২০২৩-এ ময়নামতির কমনওয়েলথ ওয়্যার সিমেট্রি পরিদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহিদ সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ২ অক্টোবর ২০২৩-এ ভারত সরকারের অনুদানে নির্মিত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কাশিনগর ডিগ্রি কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে যোগদান করেন কুমিল্লা-১১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মুজিবুল হক।

মহাত্মা গান্ধীর ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ২ অক্টোবর ২০২৩-এ নোয়াখালীতে ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং ভারতের জাতির পিতার প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তিনি গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত 'গান্ধিজিস কোয়েস্ট ফর পিস্ অ্যান্ড হারমনি ইন নোয়াখালী অ্যান্ড ইটস রিলেভ্যান্স ইন দ্য কনটেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা